# বিজ্ঞান

## মডেল টেস্ট- ০১

### বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর | ১ | N | ২ | K | ৩ | M | ৪ | L | ৫ | N | ৬ | N | ৭ | M | ৮ | L | ৯ | N | ১০ | L | ১১ | L | ১২ | M | ১৩ | K | ১৪ | M | ১৫ | K |
| | ১৬ | K | ১৭ | L | ১৮ | K | ১৯ | L | ২০ | N | ২১ | N | ২২ | K | ২৩ | M | ২৪ | L | ২৫ | K | ২৬ | M | ২৭ | N | ২৮ | M | ২৯ | K | ৩০ | L |

### সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▶ ০১** শাহিনার ওজন ৭০ কেজি এবং উচ্চতা ১.৫ মিটার। সে বার্গার, পিৎজা, চিপস জাতীয় খাবার খেতে পছন্দ করে। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম তেমন করে না। একদিন তার চাচা বাসায় বেড়াতে আসে। শাহিনা অতিরিক্ত স্থূলকায় হওয়ায় তিনি তাকে তার পছন্দের খাবারের পরিবর্তে আঁশযুক্ত খাবার খেতে বলেন।

ক. সুষম খাদ্য পিরামিড কাকে বলে? ১
খ. ডিম একটি প্রাণিজ আমিষ- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শাহিনার BMI নির্ণয় কর। ৩
ঘ. চাচার পরামর্শ অনুসারে শাহিনার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন তার সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখবে কি? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

[অধ্যায়-১ এর আলোকে]

**১নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** শর্করা জাতীয় খাদ্যকে নিচু স্তরে রেখে পরিমাণ বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে শাকসবজি, ফলমূল, আমিষ, স্নেহ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে সাজালে যে কাল্পনিক পিরামিড তৈরি হয় তাকে সুষম খাদ্য পিরামিড বলে।

**খ** প্রাণী থেকে যে আমিষ পাওয়া যায় তাকে প্রাণিজ আমিষ বলে। আমিষের একটি অন্যতম উৎস ডিম শরীরে পরিপাক হওয়ার পর অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। মানুষের শরীরে এ পর্যন্ত ২০টি অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে অপরিহার্য ৮টি অ্যামাইনো এসিড প্রাণিজ আমিষে বেশি থাকে। তাই ডিম একটি প্রাণিজ আমিষ।

**গ** দেওয়া আছে, শাহিনার ওজন = ৭০ কেজি
উচ্চতা = ১.৫ মিটার।
আমরা জানি,

$$\text{বিএমআই (BMI)} = \frac{\text{দেহের ওজন (কেজি)}}{[\text{দেহের উচ্চতা (মিটার)}]^২}$$

$$= \frac{৭০}{(১.৫)^২} = ৩১.১১ \text{ (প্রায়)}$$

অতএব, শাহিনার BMI হলো ৩১.১১ (প্রায়)।

**ঘ** শাহিনা তার চাচার পরামর্শ অনুসারে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে উল্লিখিত শাহিনা বার্গার, পিৎজা, চিপস জাতীয় খাবার পছন্দ করে। যা ফাস্ট ফুড বা জাঙ্কফুড নামে পরিচিত। স্বাস্থ্যগত উপাদানের পরিবর্তে মুখরোচক স্বাদের জন্য তৈরি জাঙ্কফুড সুস্বাদু করার জন্য অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এতে সাধারণত প্রচুর পরিমাণে প্রাণিজ চর্বি ও চিনি থাকে। এই চর্বি আমাদের শরীরে চর্বি কলায় রূপান্তরিত হয় এবং দেহকে স্থূলকায় করে তোলে। আবার অধিক পরিমাণে চিনি আমাদের দাঁত ও ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাবে জাঙ্কফুড গ্রহণে দেহের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয় না। অপরদিকে শাহিনার চাচা শাহিনার এসব পছন্দের খাবারের পরিবর্তে আঁশযুক্ত যেসব খাবার খেতে বলেন সেগুলোকে বলা হয় রাফেজ খাবার। এটি দেহে কোনো পুষ্টি না যোগালেও পরিপাকে সহায়তা করে। এটি পানি শোষণ করে ও মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাবার বারবার ক্ষুধার প্রবণতা কমাতে কাজ করে এবং শরীর থেকে অপাচ্য খাদ্য নিষ্কাশনে সহায়তা করে। এছাড়া শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করে ও দেহের স্থূলতা অনেকাংশে হ্রাস করে।

সুতরাং, শাহিনার অতিরিক্ত স্থূলতা কমাতে তার চাচার পরামর্শ অনুসারে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখবে।

**প্রশ্ন ▶ ০২**

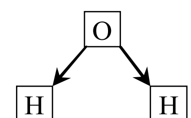


চিত্র : 'W' যৌগের গঠন

ক. পরিস্রাবণ কাকে বলে? ১
খ. পানির পুনরাবর্তন ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'W' যৌগের ওপর লবণাক্ততার প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের যৌগটির দূষণ প্রতিরোধের কৌশল বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-২ এর আলোকে]

**২নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** তরল ও কঠিন পদার্থের মিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থকে আলাদা করার প্রক্রিয়াকে পরিস্রাবণ বলে।

**খ** দিনের বেলা সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদ-নদী, খাল বিল ইত্যাদির পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। এক পর্যায়ে বাষ্প ঘনীভূত হয়ে প্রথমে মেঘ ও পরে বৃষ্টির আকারে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে। এ বৃষ্টির পানির বড় একটি অংশ নদ-নদী, খাল-বিল ও সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং আবার বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। এভাবে পানির ভূপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলে এবং বায়ুমণ্ডল থেকে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে চক্রাকারে আবর্তনকে পানির পুনরাবর্তন বলে।

**গ** উদ্দীপকে 'W' যৌগটি হলো $H_2O$ বা পানি। পানির ওপর বিশেষ করে মিঠা পানির ওপর লবণাক্ততার প্রভাব অত্যন্ত নেতিবাচক।

পানির উৎসগুলো লবণাক্ত হয়ে পড়লে প্রথমত মিঠা পানিতে বসবাসকারী জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এবং এক পর্যায়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার কারণ পানির

তাপমাত্রা বাড়লে যেরকম পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায় ঠিক সে রকম লবণাক্ততা বাড়লেও দ্রবীভূত অক্সিজেন অনেক কমে যাবে যার ফলে জলজ প্রাণীরা আর বেঁচে থাকতে পারবে না। জলজ উদ্ভিদের বড় একটি অংশ লবণাক্ত পানিতে জন্মাতেও পারে না, বেড়ে উঠতেও পারে না, যে কারণে পানির জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে। বর্তমানে সাতক্ষীরাসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলায় চিংড়ি চাষের জন্য নালা কেটে লবণাক্ত পানি মূল ভূখণ্ডে আনা হয়। এ কারণে ঐসব এলাকার ভূগর্ভের পানিসহ মিঠা পানির অন্যান্য উৎসও লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে খাওয়ার এবং ব্যবহার উপযোগী পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে।

উপরের বর্ণনার আলোকে বলা যায়, পানির উপর লবণাক্ততার প্রভাব ব্যাপক। এর ফলে পানির ব্যবহারযোগ্য উৎসগুলো ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যায়।

**ঘ** উদ্দীপকের যৌগটি হলো $H_2O$ বা পানি। নিচে পানি দূষণ প্রতিরোধের কৌশল বিশ্লেষণ করা হলো :

i. শিল্পকারখানার বর্জ্য নির্গত করার সময় এদের রাসায়নিক ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে এসব বর্জ্য পানি দূষণে ভূমিকা রাখতে না পারে।
ii. জলাভূমি ও বনভূমি রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
iii. প্লাস্টিক, পলিথিন জাতীয় পদার্থ জলাভূমিতে না ফেলা। এজন্য কঠোর আইন প্রয়োগ করে তার যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে হবে।
iv. জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে।
v. নৌযান যেমন- লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ হতে নির্গত বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ কমাতে হবে।
vi. সর্বোপরি জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে, জনগণের সহযোগিতার মাধ্যমেই পানি দূষণ প্রতিরোধ করতে হবে।

সুতরাং উপর্যুক্ত ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলে পানি দূষণ অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

**প্রশ্ন ▶ ০৩** রহমান সাহেব বুকে ব্যথা নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন। ডাক্তার তার রক্তচাপ পরীক্ষা করে ১৭০/১০০ মিলিমিটার (mm Hg) পেলেন। সেই সাথে ডাক্তার তার রক্ত পরীক্ষা করতে বললেন। রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ পাওয়া যাওয়ায় ডাক্তার তাকে ব্যবস্থাপত্র ও কিছু পরামর্শ দিলেন।

ক. শিরা কাকে বলে? ১
খ. হার্ট বিট বলতে কী বুঝায়? ২
গ. রহমান সাহেবের উল্লিখিত প্রথম রোগটির লক্ষণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রহমান সাহেবের উল্লিখিত রোগ দুটির একটি প্রতিরোধযোগ্য হলেও অপরটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য– বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৩ এর আলোকে]

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যেসব রক্তনালি কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে, তাদের শিরা বলে।

**খ** হৃৎপিণ্ড একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্পের মতো দেহের ভিতরে সারাক্ষণ ছন্দের তালে স্পন্দিত হয়। হৃৎপিণ্ডের এই স্পন্দনই হলো হৃৎস্পন্দন বা হার্ট বিট। এ হৃৎস্পন্দনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড আমাদের শরীরের রক্ত প্রবাহিত করে। একটি সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের সমন্বয়ে একটি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন হয় এবং সময় লাগে প্রায় ০.৮ সেকেন্ড। একজন সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৬০-১০০ বার হয়।

**গ** উদ্দীপকে রহমান সাহেবের উল্লিখিত প্রথম রোগটি হলো উচ্চ রক্তচাপজনিত বুকে ব্যথা যা অ্যানজাইনা নামে পরিচিত। নিচে অ্যানজাইনার লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো–

i. স্টার্নামের পেছনে বুকে ব্যথা হওয়া।
ii. ব্যায়াম বা অন্য শারীরিক কাজে, মানসিক চাপ, অতিরিক্ত ভোজন, শীতকাল বা আতঙ্কে বুকে ব্যথা হতে পারে। ব্যথা ৫-৩০ মিনিট স্থায়ী হয়।
iii. অ্যানজাইনা গলা, কাঁধ, চোয়াল, বাহু, পিঠ এমনকি দাঁতেও ছড়াতে পারে।
iv. অনেক সময় ব্যথা কোত্থেকে আসছে তাও বোঝা যায় না।
v. বুকে জ্বালাপোড়া, চাপ, নিষ্পেষণ বা আড়ষ্ট ভাব সৃষ্টি হয়ে অস্বস্তির প্রকাশ ঘটায়।
vi. বুকে ব্যথা ছাড়াও হজমে গণ্ডগোল ও বমি বমি ভাব হতে পারে।
vii. ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কিংবা দম ফুরিয়ে হাঁপান দেখা দিতে পারে।

অনেক রোগী অ্যানজাইনা টের পায় না, তবে কাঁধ ও বাহু ভারী হয়ে আসে। বুকে ব্যথার সাথে সাথে ঘাম হয়, মাথা ঝিমঝিম করে বা শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। রোগী চিন্তান্বিত থাকে ও মাথা ঝুলে থাকে। সারাদিন দুর্বল ও পরিশ্রান্ত থাকে এবং সহজ কাজও কঠিন মনে হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে রহমান সাহেবের উল্লিখিত রোগ দুটির প্রথমটি উচ্চ রক্তচাপজনিত বুকে ব্যথা যা অ্যানজাইনা নামে পরিচিত। এ রোগটি প্রতিরোধযোগ্য হলেও, দ্বিতীয় রোগটি ডায়াবেটিস যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য। উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতামূলক উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে সহজেই এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যেমন–

i. ডায়াবেটিস যদি থাকে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা।
ii. দেহের ওজন বৃদ্ধি না করা।
iii. চর্বিযুক্ত খাবার বর্জন করা। যেমন– ঘি, মাখন, গরু ও খাসির মাংস, চিংড়ি ইত্যাদি।
iv. সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।
v. পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
vi. মদ্যপান এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকা।
vii. মানসিক চাপমুক্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা।
viii. খাবারের সাথে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
ix. চিকিৎসকের পরামর্শমতো জীবন পরিচালনা করা।

অন্যদিকে ডায়াবেটিস রোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই। তবে কিছু নিয়ম অবলম্বনের মাধ্যমে এ রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। যেমন–

**পথ্য নিয়ন্ত্রণ :**

i. রহমান সাহেবকে এমন খাবার খেতে হবে যা প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং যাতে শ্বেতসার কম থাকে। যেমন– গাঢ় সবুজ রঙের শাকসবজি, বরবটি, মাশরুম, বাদাম, ডিম, মাছ, চর্বি ছাড়া মাংস ইত্যাদি।
ii. চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে।

**জীবন শৃঙ্খলা :**

i. নিয়মিত ও পরিমাণমতো সুষম খাবার খেতে হবে।
ii. নিয়মিত ও পরিমাণমতো ব্যায়াম করতে হবে।
iii. নিয়মিত রক্তে ও প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ পরিমাপ করে ফলাফল লিখে রাখতে হবে।

**ঔষধ সেবন :** খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা মেনে চলে ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। যদি তার ইনসুলিন নেওয়ার প্রয়োজন হয় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ইনসুলিন গ্রহণ করতে হবে।

রহমান সাহেব যদি যথাযথভাবে উপরের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে পারেন তবে তার রোগটি নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

**প্রশ্ন ▶ ০৪** তমার জীববিজ্ঞান পড়ার প্রতি খুব আগ্রহ। সে উচ্চতর বই পড়ে জেনেছে যে সকল প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে অ্যামাইনো এসিড ও প্রোটিন সহযোগে। পাখির ডানা ও মানুষের হাতের উৎপত্তি একই স্থান থেকে হলেও বাহ্যিক গঠন ভিন্ন। এর কারণ বিবর্তন।

ক. কানেকটিং লিজ্ক কী? ১

খ. টেস্টোস্টেরন হরমোনের প্রভাবে কী পরিবর্তন হয়? ২

গ. তমার দেখা জীব দুটির অঙ্গের বাহ্যিক গঠনের ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি একটি মন্থর ও গতিশীল প্রক্রিয়া। তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[অধ্যায়-৪ এর আলোকে]

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** জীবজগতে এমন জীবের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়, যাদের মধ্যে দুটি জীবগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ ধরনের জীবই হলো সংযোগকারী জীব বা কানেকটিং লিজ্ক।

**খ** শরীরের ভেতর স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি রাসায়নিক পদার্থ হরমোন দেহের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিবাহিত হয়। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য দায়ী হরমোনটি হলো টেস্টোস্টেরন। এ হরমোনের প্রভাবে তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। ছেলেদের গলার স্বর ভারী হয়, মুখে দাড়ি ও গোঁফ গজায়, দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি হয়।

**গ** তমার দেখা জীব দুটির অঙ্গগুলো হলো- পাখির ডানা ও মানুষের হাত। জীব দুটির অঙ্গের বাহ্যিক ভিন্নতার কারণ বিবর্তনের অঙ্গস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়-

পাখির ডানা ও মানুষের হাতের অভ্যন্তরীণ গঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এদের উভয়েরই হিউমেরাস, রেডিও-আলনা, কার্পাল, মেটাকার্পাল ও ফ্যালাঞ্জেস অস্থিগুলো উপর থেকে নিচের দিকে পরপর সজ্জিত রয়েছে। বহিরাকৃতিতে যে বৈসাদৃশ রয়েছে তা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হওয়ার জন্যই ঘটেছে। পাখির ডানা ওড়ার জন্য এবং মানুষের হাত কোনো কিছু ধরার জন্য ও সৃজনশীল কাজের জন্য পরিবর্তিত হয়েছে। নিরাপদ আশ্রয় ও খাদ্যের জন্য প্রাণীদের মধ্যে অভিযোজন পরিলক্ষিত হয়। আর এ কারণেই জীব দুটির অঙ্গের আপাতদৃষ্টিতে আকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও অভ্যন্তরীণ কাঠামো পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এদের অস্থিবিন্যাস মৌলিক প্রকৃতির এবং তা অভিযোজনের জন্য বাহ্যিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি হলো বিবর্তন। বিবর্তন যে একটি মন্থর ও গতিশীল প্রক্রিয়া নিম্নে এর সপক্ষে যুক্তি দেওয়া হলো-

বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীতে আমরা যেসব জীবের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মধ্যে দশ লাখের বেশি প্রাণী প্রজাতি এবং চার লাখের মতো উদ্ভিদ প্রজাতি শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। একসময় মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী অপরিবর্তিত, অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর যে আকার বা আয়তন ছিল, এখনো সেরকমই আছে। আদি জীবজগতের সঙ্গে বর্তমানকালের জীবজগতের কোনো পার্থক্য নেই। এ বিষয়টি মানুষের ভাবনায় ছিল। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জেনোফেন নামের একজন বিজ্ঞানী প্রথম কতকগুলো জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, অতীত এবং বর্তমান যুগের জীবদেহের গঠনে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ জীবদেহের আকার অপরিবর্তনীয় নয়।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল প্রমাণ করেন যে, জীবজগতের বিভিন্ন জীবের ভেতর এক শ্রেণির জীব অন্য শ্রেণির জীব থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং জীবগুলো তাদের পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বিবর্তন বা অভিব্যক্তির মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বিবর্তন একটি মন্থর ও গতিশীল প্রক্রিয়া এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গঠনগতভাবে সরল জীবন থেকে জটিল জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে।

**প্রশ্ন ▶ ০৫**

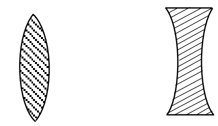

চিত্র-১ চিত্র-২

ক. আলোর প্রতিসরণের ২য় সূত্রটি বিবৃত কর। ১

খ. আমরা কীভাবে দেখতে পাই? ২

গ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর তুলনা কর। ৩

ঘ. চোখের ত্রুটি দূরীকরণে চিত্র-১ ও চিত্র-২ সহায়ক ভূমিকা পালন করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৫ এর আলোকে]

### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আলোর প্রতিসরণের ২য় সূত্রটি হলো- একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট বর্ণের আলোকরশ্মির জন্য আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদাই ধ্রুব থাকে।

**খ** কোনো বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে এসে পড়লে ঐ আলোক রশ্মি চোখের লেন্স দ্বারা প্রতিসরিত হয় এবং রেটিনার উপর একটি উল্টো প্রতিবিম্ব গঠন করে। রেটিনার উপর আলো পড়লে স্নায়ুর সাথে সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রড ও কোনকোষসমূহ ঐ আলোকে তড়িৎ প্রেরণায় পরিণত করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মস্তিষ্ক রেটিনায় সৃষ্ট উল্টো প্রতিবিম্বকে পুনরায় উল্টো করে দেয়। ফলে আমরা কোনো বস্তুকে দেখতে পাই।

**গ** উদ্দীপকের চিত্র-১ হচ্ছে উত্তল লেন্স এবং চিত্র-২ অবতল লেন্স। নিচে লেন্স দুটির মধ্যে তুলনা করা হলো-

| উত্তল লেন্স | অবতল লেন্স |
|---|---|
| ১. এটির মধ্যভাগ মোটা এবং প্রান্তের দিকে সরু। | ১. এটির মধ্যভাগ সরু এবং প্রান্তের দিকে মোটা। |
| ২. এটি আলোকরশ্মিকে অভিসারী করে। | ২. এটি আলোকরশ্মিকে অপসারী করে। |
| ৩. এ লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ও ক্ষমতা ধন রাশি। | ৩. এ লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ও ক্ষমতা ঋণ রাশি। |
| ৪. এ লেন্সের প্রতিবিম্ব বাস্তব বা অবাস্তব হতে পারে। | ৪. এ লেন্সের প্রতিবিম্ব সর্বদা অবাস্তব। |
| ৫. এটির প্রতিবিম্ব সিধা বা উল্টা হতে পারে। | ৫. এটির প্রতিবিম্ব সর্বদা সিধা। |
| ৬. এ লেন্সের প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর আকারের চেয়ে বড় বা ছোট হতে পারে। | ৬. এ লেন্সের প্রতিবিম্বের আকার সর্বদা বস্তুর আকারের চেয়ে ছোট। |
| ৭. আতশী কাচ, চশমা, ক্যামেরা, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ ও বিবর্ধক কাচ হিসেবে এ লেন্স ব্যবহৃত হয়। | ৭. গ্যালিলিও-র দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং চশমায় এ লেন্স ব্যবহার করা হয়। |

**ঘ** উদ্দীপকের চিত্র-১ ও চিত্র-২ হলো যথাক্রমে উত্তল লেন্স ও অবতল লেন্স। চোখের ত্রুটি দূরীকরণে এ লেন্স দুটির ভূমিকা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

কোনো ব্যক্তি কাছের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু দূরের বস্তু দেখতে না পাওয়ায় সৃষ্ট ক্ষীণদৃষ্টি ত্রুটি চোখের অভিসারী ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হয়। চোখের অভিসারী ক্ষমতা কমানোর জন্য এমন একটি অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে যার ফোকাস দূরত্ব হবে ক্ষীণদৃষ্টি বা হ্রস্বদৃষ্টির দীর্ঘতম দূরত্বের সমান। কারণ এই চশমা লেন্সের অপসারী ক্রিয়া চোখের উত্তল লেন্সের অভিসারী ক্রিয়ার বিপরীতে ক্রিয়া করে। ফলে অসীম দূরত্বের বস্তু থেকে নির্গত সমান্তরাল আলোকরশ্মি এই সাহায্যকারী অবতল লেন্সের মধ্য দিয়ে চোখে পড়ার সময় প্রয়োজনমতো অপসারিত হয় এবং অপসারিত রশ্মিগুলো চোখের লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে রেটিনার উপর পড়ে। ফলে বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

আবার কোনো ব্যক্তি দূরের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু কাছের বস্তু দেখতে না পাওয়ায় সৃষ্ট দীর্ঘদৃষ্টি ত্রুটি চোখের অভিসারী ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণে হয়। চোখের এ অভিসারী ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এমন একটি উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে যার ফোকাস দূরত্ব হবে দীর্ঘদৃষ্টির নিকটতম দূরত্বের সমান। কারণ এ লেন্সের অভিসারী ক্রিয়া চোখের লেন্সের অভিসারী ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়। ফলে চোখের নিকটতম বিন্দু থেকে আগত সমান্তরাল আলোকরশ্মি এ সাহায্যকারী উত্তল লেন্সের মধ্য দিয়ে চোখে পড়ার সময় প্রয়োজনমতো অভিসারী হয়ে রেটিনার উপর পড়ে। ফলে বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

এভাবেই চোখের ত্রুটি দূরীকরণে উত্তল ও অবতল লেন্স সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন ▸ ০৬** $n(CH_2 = CH_2) \xrightarrow[O_2 \text{ প্রভাবক}]{\text{উচ্চতাপ ও চাপ}} \boxed{A}_n$

ক. মনোমার কী? ১

খ. রেশমকে তন্তুর রানি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'A' এর উৎপাদন কৌশল বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'A' এর অপব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার জন্য দায়ী–যুক্তি দাও। ৪

[অধ্যায়-৬ এর আলোকে]

**৬নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অনেকগুলো ছোট অণু পরপর সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তৈরি পলিমার হলো মনোমার।

**খ** রেশমের প্রধান গুণ এর সৌন্দর্য। তিন শতাধিক রঙের রেশম পাওয়া যায়। বিলাসবহুল বস্ত্র তৈরিতে রেশম তন্তু ব্যবহৃত হয়। আগেকার দিনের রাজা-রানির পোশাক বলতে আমরা রেশমি পোশাকই বুঝি। এছাড়া প্রাকৃতিক প্রাণিজ তন্তুর মধ্যে রেশম সবচেয়ে শক্ত ও দীর্ঘ। এ সমস্ত নানাবিধ গুণাগুণের জন্য রেশমকে তন্তুর রানি বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের A হলো পলিথিন। পলিথিনের উৎপাদন কৌশল নিচে বর্ণনা করা হলো–

ইথিলিন গ্যাসকে ১০০০-১২০০ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ২০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে পলিথিন পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে পলিমারকরণ দ্রুত করার জন্য প্রভাবক হিসেবে অক্সিজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

$$n\ (\text{ইথিলিন}) \xrightarrow[O_2 \text{ প্রভাবক}]{\text{উচ্চতাপ ও চাপ}} \text{পলিথিন}$$

$$n\ (CH_2 = CH_2) \xrightarrow[O_2 \text{ প্রভাবক}]{\text{উচ্চতাপ ও চাপ}} (-CH_2-CH_2-)_n$$

উচ্চচাপ পদ্ধতি সহজসাধ্য না হওয়ায় এ প্রক্রিয়াটি তেমন জনপ্রিয় নয়। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে টাইটেনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ($TiCl_3$) নামক প্রভাবক ব্যবহার করে সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে পলিথিন তৈরি করা হয়।

$$n\ (\text{ইথিলিন}) \xrightarrow[TiCl_3 \text{ প্রভাবক}]{\text{উচ্চতাপ}} \text{পলিথিন}$$

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত A হচ্ছে পলিথিন। পলিথিনের অপব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার জন্য দায়ী। নিচে এটি যুক্তিসহ উপস্থাপন করা হলো–

পলিথিন অন্যান্য কৃত্রিম পলিমারের মতো পচনশীল নয়। এর ফলে পুনঃব্যবহার না করে বর্জ্য হিসেবে অপসারণ করলে এগুলো পরিবেশে জমা হতে থাকে এবং নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। একপর্যায়ে নালা বন্ধ হয়ে যায় ও নর্দমার নালায় পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই রাস্তায় পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। পলিথিন জাতীয় বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবস্থাপনার আওতায় না আনা হলে এগুলো নদনদীসহ অন্যান্য জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। এতে নদনদীর গভীরতা কমে যায়, যা নাব্যতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো মাটিতে পড়ে থাকলে মাটির উর্বরতা নষ্ট করতে পরে। যেহেতু পচনশীল নয় তাই পশুর খাবারের সাথে পাকস্থলীতে গিয়ে এরা এক পর্যায়ে মাংস ও চর্বিতে জমতে থাকে। এ সমস্ত মাছ, মাংস গ্রহণ করলে তা মানবদেহেও প্রবেশ করে এবং ক্যানসারের মতো রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

উপরে বর্ণিত কারণেই পলিথিনের অপব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্যহীতার জন্য দায়ী।

**প্রশ্ন ▸ ০৭**

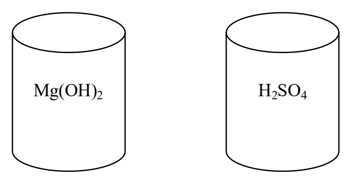


পাত্র-X পাত্র-Y

ক. হিউমাস কাকে বলে? ১

খ. বিয়ে বাড়িতে খাবার পরে আমরা বোরহানি খাই কেন? ২

গ. পাত্র-X এবং পাত্র-Y এর পদার্থ দুটির মধ্যে বিক্রিয়া সংঘটিত হলে কী ঘটবে? সমীকরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে উদ্দীপকের পদার্থ দুটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

[অধ্যায়-৭ এর আলোকে]

**৭নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থকে হিউমাস বলে।

**খ** আমরা জানি, খাবার হজম করার জন্য আমাদের পাকস্থলীতে নির্দিষ্ট মাত্রায় হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রয়োজন হয়। এই মাত্রার তারতম্য হলে আমাদের পরিপাকে সমস্যা হয়। বোরহানি অল্পমাত্রায় এসিডিক। তাই বিয়ে বাড়িতে মাংস, পোলাও, বিরিয়ানি ইত্যাদি গুরুপাক খাদ্য খাবার পর ল্যাকটিক এসিড বিদ্যমান বোরহানি পান করলে আমাদের পরিপাকে বা হজমে সহায়তা করে। এজন্য বিয়ে বাড়িতে খাবার পর আমরা বোরহানি খাই।

**গ** উদ্দীপকে পাত্র 'X' এর পদার্থটি হচ্ছে $Mg(OH)_2$ যা ক্ষার এবং পাত্র 'Y' এর পদার্থটি হচ্ছে $H_2SO_4$ যা এসিড। এদের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়া হচ্ছে-

$H_2SO_4 + Mg(OH)_2 \rightarrow MgSO_4 + 2H_2O$

বিক্রিয়া হতে দেখা যায়, $H_2SO_4$ ও $Mg(OH)_2$ এর মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে $MgSO_4$ এবং পানি উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন পদার্থ $MgSO_4$ এক ধরনের লবণ। অর্থাৎ এসিড ও ক্ষারের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়ার ফলে লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়। সুতরাং সংঘটিত বিক্রিয়াটি এক ধরনের প্রশমন বিক্রিয়া।

**ঘ** উদ্দীপকের পদার্থ দুটির মধ্যে $H_2SO_4$ হচ্ছে এসিড এবং $Mg(OH)_2$ হচ্ছে ক্ষার। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এদের ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো–

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় কাজে সালফিউরিক এসিডের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ঔষধ তৈরি, ধাতু নিষ্কাশন, পেট্রোলিয়াম শোধন এবং কীটনাশক তৈরি প্রভৃতিতে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয়। ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষিজমিতে ব্যবহৃত সার তৈরিতে এ এসিড অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। আবার টয়লেট পরিষ্কারক হিসেবে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয়। সৌর প্যানেল তৈরি, সৌরবিদ্যুৎ সংরক্ষণের জন্য বা বাসাবাড়িতে আইপিএস (IPS) চালানোর জন্য এবং গাড়িতে যে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় তার অত্যাবশ্যকীয় একটি উপাদান হলো সালফিউরিক এসিড। অপরদিকে এসিডের মতো ক্ষারও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন কাজে লাগে। পাকস্থলীতে এসিডিটির জন্য পেটের ব্যথা দূর করতে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নামক ক্ষারের তৈরি এন্টাসিড সেবন করা হয়। এতে এসিডিটির জন্য দায়ী হাইড্রোক্লোরিক এসিডকে নিষ্ক্রিয় করতে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্ষারটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এসিড ও ক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন ▸ ০৮** রবিউল একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভিডিও দেখছিল। সেখানে সমুদ্রের পানির ঢেউয়ের উচ্চতা বেড়ে উপকূলের জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দিল। এমন সময় সে অনুভব করল তার ঘরের আসবাবপত্রসহ বিল্ডিং কাঁপছে।

ক. সাইক্লোন কাকে বলে? ১

খ. বৈশ্বিক উষ্ণতা বিপজ্জনক কেন? ২

গ. রবিউলের দেখা দুর্যোগটি কীভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রবিউলের অনুভব করা দুর্যোগটি মোকাবিলায় কী কী করণীয়? ব্যাখ্যা কর। ৪

[অধ্যায়-৯ এর আলোকে]

**৮নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** উষ্ণ কেন্দ্রীয় যে লঘুচাপ, যার চারদিকে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রচণ্ডভাবে ঘুরতে থাকে তাকে সাইক্লোন বলে।

**খ** বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যাবে। ফলে জলবায়ুজনিত পরিবর্তন ঘটবে এবং এতে ঋতুর পরিবর্তন, ঘন ঘন বন্যা, নদী ভাঙন, দীর্ঘমেয়াদি খরা, পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, সামুদ্রিক প্রবাল ঝুঁকি, বনাঞ্চলের বিলুপ্তি, মৎস্য সম্পদ হ্রাস, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করবে। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সর্বোচ্চ বিপজ্জনক যা ঘটবে তা হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। এরূপ নানাবিধ কারণেই বৈশ্বিক উষ্ণতা বিপজ্জনক।

**গ** উদ্দীপকে রবিউলের দেখা দুর্যোগটি হলো ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় গভীর সমুদ্রে। মূলত দুটি কারণ ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে, তা হলো– নিম্নচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রা। নিচে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করা হলো–

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাগরে সাধারণত বিষুবরেখার ৫° থেকে ৮° উত্তর অক্ষাংশে বা তার উত্তর দিকে যেখানে সাগরের পানির তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াসের বেশি থাকে সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। বিষুব অঞ্চল অপেক্ষাকৃত গরম থাকার কারণে সেখানে লঘুচাপ বিদ্যমান থাকে।

উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে প্রবাহিত দু'ধরনের মৌসুমি বায়ু বিষুব অঞ্চলের লঘুচাপ এলাকায় একে অপরের মুখোমুখি হয়। প্রবাহিত বিপরীতমুখী বায়ুর সংযোগস্থলে ছোট ছোট ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণি এলাকায় বায়ুচাপের যে শূন্যতা দেখা দেয় তা পূরণের জন্য পার্শ্ববর্তী উচ্চচাপ এলাকার ঠান্ডা ও ভারী বাতাস সজোরে প্রবাহিত হতে থাকে। পৃথিবীর ঘোরার ফলে প্রবাহিত ঠান্ডা ও ভারী বাতাস ঘূর্ণি এলাকার কেন্দ্রে ঘুরতে ঘুরতে প্রবেশ করে। কেন্দ্রে বায়ুচাপ অত্যন্ত কম থাকায় ঘূর্ণায়মান বাতাস সেখানে আসার পরই অস্থিতিশীল হয়ে প্রবলবেগে উপরের দিকে উঠতে থাকে বলে ঘূর্ণির তীব্রতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

**ঘ** উদ্দীপকে রবিউলের অনুভব করা দুর্যোগটি হলো ভূমিকম্প। এটি কখন কোথায় হবে তা কেউই বলতে পারে না। তাই এ দুর্যোগটি সংঘটিত হলে তা থেকে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। তবে ভূমিকম্প মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে এর দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়। এক্ষেত্রে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

**ভূমিকম্পের আগে :**

১. সম্ভব হলে সব বাসাতেই অগ্নিনির্বাপক প্রস্তুতি রাখতে হবে। এর সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, বাটারি চালিত রেডিও, টর্চলাইট, কিছু বাড়তি ব্যাটারি, শুকনো খাবার এবং পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. বাসার গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি এবং পানি সরবরাহ কীভাবে বন্ধ করতে হয় সেটাও জেনে রাখতে হবে।

৩. বাসায় উঁচু সেলফে ভারী জিনিস রাখা যাবে না।

**ভূমিকম্পের সময় করণীয় :**

১. ভূমিকম্পের সময় ভয়ে এবং আতঙ্কে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য না হয়ে যথাসম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে ভূমিকম্পের বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

২. ঘরের ভিতর থাকলে হুড়োহুড়ি করে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা না করে শক্ত কোনো টেবিলের নিচে আশ্রয় নিতে হবে। কখনোই লিফট দিয়ে নামার চেষ্টা করা যাবে না।

৩. ঘরের বাইরে থাকলে ঘরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা না করে ইলেকট্রিক পোল বা বড় বিল্ডিং থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে।

৪. কোনো অবস্থাতেই ম্যাচ ও বাতি জ্বালানো যাবে না।

**ভূমিকম্পের পরে করণীয় :**

১. বড় ভূমিকম্প হয়ে থাকলে নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে কেউ আহত হয়েছি কি–না। আহত হলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে। গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে নিতে হবে।

২. পানি, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাসলাইন পরীক্ষা করতে হবে। যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে।

৩. ক্ষতিগ্রস্ত বিল্ডিংয়ের বাইরে থাকতে হবে। ভাঙা কাচ ইত্যাদিতে যেন পা কেটে না যায়, সেজন্য খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করা যাবে না।

৪. ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিংয়ের নিচে আটকা পড়লে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা না করে উদ্ধাকারীদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

**প্রশ্ন ▶ ০৯** ৩০ কেজি ভরের একটি বস্তুর উপর ৩০০ নিউটন বল ক্রিয়া করায় বস্তুটি ত্বরণ প্রাপ্ত হলো এবং একটি দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসল।

ক. জড়তা কী? ১
খ. অভিকর্ষ বলকে মহাকর্ষ বল বলা হয় কেন? ২
গ. বস্তুটির ত্বরণ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ২য় ঘটনাটি নিউটনের কোন সূত্রকে সমর্থন করে? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-১০ এর আলোকে]

**৯নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বস্তু যে অবস্থায় আছে চিরকাল সেই অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা সেই অবস্থা বজায় রাখতে চাওয়ার যে ধর্ম তাই জড়তা।

**খ** মহাকর্ষ বল হলো যেকোনো দুটি বস্তুকণার মধ্যকার আকর্ষণ বল। অন্যদিকে অভিকর্ষ বল হলো পৃথিবী ও মহাবিশ্বের যেকোনো একটি বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণ বল। অর্থাৎ পৃথিবীও মহাবিশ্বের একটি বস্তু। এজন্য অভিকর্ষ বলকে মহাকর্ষ বল বলা হয়।

**গ** উদ্দীপক হতে পাই, বস্তুর ভর, $m = $ ৩০ কেজি
ক্রিয়াশীল বল, $F = $ ৩০০ নিউটন
বস্তুটির ত্বরণ, $a = ?$

আমরা জানি, $F = ma$

বা, $a = \frac{F}{m} = \frac{\text{৩০০ নিউটন}}{\text{৩০ কেজি}}$

$\therefore a = $ ১০ মিটার/সেকেন্ড$^2$

অতএব, বস্তুটির ত্বরণ ১০ মিটার/সেকেন্ড$^2$।

**ঘ** উদ্দীপকের ২য় ঘটনাটি নিউটনের তৃতীয় সূত্রকে সমর্থন করে। নিচে এটি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করা হলো-
নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে আমরা জানি, প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে। উদ্দীপক অনুসারে ৩০ কেজি ভরের বস্তুর উপর ৩০০ নিউটন বল প্রয়োগ করায় বস্তুটি ত্বরণ প্রাপ্ত হয়ে একটি দেয়ালে আঘাত করে। কিন্তু বস্তুটির আঘাতের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বস্তুটি আবার ফিরে আসে। অর্থাৎ বস্তুটির ক্রিয়া বলের কারণে দেয়াল বস্তুটির উপর একটি সমান ও বিপরীমুখী প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করেছে।

সুতরাং, উদ্দীপকের ২য় ঘটনাটি নিউটনের ৩য় সূত্রকে সমর্থন করে।

**প্রশ্ন ▶ ১০** নিচের চিত্র দুটি লক্ষ কর :

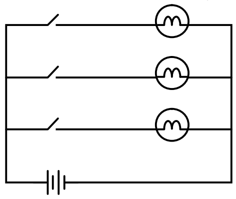
চিত্র-১

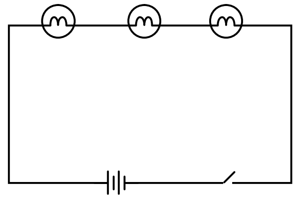
চিত্র-২

ক. তড়িৎ বিশ্লেষণ কাকে বলে? ১
খ. বর্তমানে সাধারণ বালবের পরিবর্তে এনার্জি সেভিং বালব ব্যবহার করা হয় কেন? ২
গ. চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এর গঠন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. গৃহ বিদ্যুতায়নে উদ্দীপকের চিত্র দুটির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক তোমার মতামত দাও। ৪

[অধ্যায়-১২ এর আলোকে]

**১০নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** কোনো দ্রবণের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত করে এর অণুগুলোকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অংশে বিভক্ত করার পদ্ধতিকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলে।

**খ** এনার্জি বালব সাধারণ বালবের চেয়ে ৩ থেকে ২৫ গুণ বেশি টিকে থাকে এবং এটি চালনা করতে কম শক্তির প্রয়োজন হয়। ফলে অর্থনৈতিক সাশ্রয় হয়। এছাড়া এনার্জি বালব ব্যবহার করে শক্তির অপচয় রোধ করে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানো যায়। এজন্য বর্তমানে সাধারণ বালবের পরিবর্তে এনার্জি সেভিং বালব ব্যবহার করা হয়।

**গ** উদ্দীপকের চিত্র-১ এ একটি সমান্তরাল বর্তনী এবং চিত্র-২ এ একটি শ্রেণি বর্তনী দেখানো হয়েছে। নিচে বর্তনী দুটির গঠন বর্ণনা করা হলো–
সমান্তরাল বর্তনীটিতে ৩টি বালব এর প্রতিটির এক প্রান্ত একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অপর প্রান্ত অপর একটি সাধারণ বিন্দুতে রেখে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি বালবের সাথে একটি করে সুইচ সংযুক্ত আছে। এছাড়া বর্তনীর সাথে একটি ব্যাটারি সংযুক্ত আছে। বর্তনীতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হলে এটির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। অর্থাৎ প্রতিটি বালব সমান ভোল্টেজ পাবে এবং একই মাত্রায় জ্বলবে। অপরদিকে শ্রেণি বর্তনীটিতে তিনটি বালব পরপর অর্থাৎ একটির এক প্রান্তের সাথে অপরটির এক প্রান্ত এবং অপরটির অপর প্রান্তের সাথে পরেরটির এক প্রান্ত যুক্ত আছে। এছাড়া একটি ব্যাটারি সংযোগ এবং একটি সুইচ বা চাবি দেখানো হয়েছে। বর্তনীটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হলে এটির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে।

**ঘ** উদ্দীপকে চিত্র-১ এর বর্তনীটি একটি সমান্তরাল বর্তনী এবং চিত্র- ২ এর বর্তনীটি একটি সিরিজ বর্তনী। গৃহ বিদ্যুতায়নে চিত্র-১ এর বর্তনী তথা সমান্তরাল বর্তনীর ব্যবহার বেশি সুবিধাজনক। নিচে এর সপক্ষে আমার মতামত তুলে ধরা হলো–

আমরা জানি, সিরিজ সংযোগে একই বিদ্যুৎ প্রবাহ সকল বালবের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। একটি বালব বিদ্যুৎ প্রবাহে যতটুকু বাধা দেয়, সকল বালব তার চেয়ে বেশি বাধা দেয়। তাই একটি বালব যত উজ্জ্বলভাবে জ্বলে তিনটি বালব তার চেয়ে কম উজ্জ্বলভাবে জ্বলে। এছাড়া বর্তনীতে একটি বালব ফিউজ হলে সমস্ত বর্তনীর মধ্য দিয়েই বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অপর বালবগুলো জ্বলে না। আবার সুইচ অন করলে একই সাথে তিনটি বালব জ্বলে ওঠে এবং সুইচ অফ করলে একই সাথে তিনটি বালব নিভে যাবে। বালব তিনটিকে পৃথকভাবে জ্বালানো বা নিভানো যায় না।

অপরদিকে, সমান্তরাল সংযোগের ফলে প্রত্যেকটি বালবের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। তাই সমান্তরাল বর্তনীর একটি বালব ফিউজ হলেও অন্য বাল্বগুলো জ্বলে। প্রতিটি বালবই পৃথকভাবে জ্বালানো ও নেভানো যায়। প্রতিটি বালবের প্রান্তদ্বয়ের বিভব পার্থক্য একই থাকে। অর্থাৎ সমান্তরাল বর্তনীর প্রতিটি বালবই বিদ্যুৎ কোষের পূর্ণ বিদ্যুচ্চালক শক্তি পায়। ফলে বর্তনীর তিনটি বালবই সমান উজ্জ্বলভাবে জ্বলে। সুতরাং বলা যায়, গৃহ বিদ্যুতায়নে শ্রেণি বর্তনীর তুলনায় সমান্তরাল বর্তনীই বেশি সুবিধাজনক।

**প্রশ্ন ▸ ১১** সিয়াম সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করে। দিনের অধিকাংশ সময় তাকে কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়। ইদানীং তার ঘাড় ও পিঠে ব্যথা হচ্ছে এবং চোখেও সমস্যা হচ্ছে।

ক. ফ্যাক্স কী? ১

খ. ডিজিটাল সংকেত বলতে কী বুঝায়? ২

গ. সিয়ামের ব্যবহৃত যন্ত্রটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সিয়ামের সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

[অধ্যায়-১৩ এর আলোকে]

**১১নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ফ্যাক্স হলো তার বা রেডিওর সাহায্যে গ্রাফিক্যাল তথ্য বা যেকোনো লিখিত ডকুমেন্ট হুবহু কপি করে প্রেরণ ও গ্রহণের একটি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা।

**খ** যখন কোনো সংকেতের মানকে সংখ্যা বা ডিজিটে পরিবর্তন করা হয় তখন তাকে ডিজিটাল সংকেত বলে। এ ব্যবস্থায় বাইনারি কোড অর্থাৎ ০ ও ১ ব্যবহার করে যে কোনো তথ্য, সংখ্যা, অক্ষর, বিশেষ সংকেত ইত্যাদি বুঝানো বা প্রেরিত হয়। অ্যানালগ সংকেত ডিজিটাল সংকেতে পরিবর্তিত হলে নয়েজ সহজেই অনুপ্রবেশ করতে পারে না। ফলে ডিজিটাল সংকেতের গুণগত মান অবিকৃত থাকে।

**গ** সিয়ামের ব্যবহৃত যন্ত্রটি হলো কম্পিউটার। নিচে কম্পিউটারের গঠন ব্যাখ্যা করা হলো−

একটি কম্পিউটারের মাইক্রোপ্রসেসর ও মেমোরি এ দুটি মূল অংশ থাকে। মেমোরির ভেতর কিছু ডিজিটাল সিগন্যালের নির্দেশ বা ইনস্ট্রাকশন জমা করা থাকে। মেমোরি থেকে এ ইনস্ট্রাকশনগুলো মাইক্রোপ্রসেসরে প্রেরণ করা হয়। কম্পিউটারের এ অংশটি কোন ইনস্ট্রাকশনের জন্য কী করতে হবে, সেটি জানে এবং তার জন্য বরাদ্দকৃত কাজটি শেষ করে এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন ফলাফলটি আবার মেমোরিতে জমা করে দেয়। এভাবে মেমোরিতে রাখা সবগুলো ইনস্ট্রাকশন শেষ করা হলে তার প্রোগ্রাম সম্পন্ন হয়। কম্পিউটারের তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য মেমোরির পাশাপাশি স্থায়ীভাবে হার্ডড্রাইভের প্রয়োজন হয়।

কম্পিউটারে একটি প্রোগ্রাম চালাতে হলে তার সাথে বাইরে থেকে যোগাযোগ করতে হয়। ইনপুট ডিভাইস কি-বোর্ড ও মাউস কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে কার্যক্রম সচল রাখে। আবার কম্পিউটার মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত ডেটা বা উপাত্ত ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। বর্তমান সময়ে কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে নেটওয়ার্কিং। প্রতিটি কম্পিউটারেই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড থাকে। এটি একটি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকে এবং কম্পিউটার সেটি দিয়ে তথ্য গ্রহণ করে আবার তথ্যকে প্রেরণ করে।

**ঘ** মাত্রাতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারে সিয়ামের দেহে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। এসব সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে আমার মতামত হলো−

i. কম্পিউটারে কাজ করার সময় সঠিকভাবে বসতে হবে এবং সোজা সামনে তাকাতে হবে।

ii. সঠিক পদ্ধতিতে টাইপ করতে হবে। টাইপ করার সময় হাত যেন কোনো কিছুর ওপর রাখা না থাকে এবং হাত ও আঙুল যেন সোজা থাকে।

iii. কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্তত আধা ঘণ্টা পর পর ৫ মিনিটের জন্য বিশ্রাম নিতে হবে এবং কাঁধ ও ঘাড়কে রিলাক্স করতে দিতে হবে।

iv. কম্পিউটারের পর্দাটি যেন অবশ্যই চোখ থেকে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার দূরে থাকে।

v. কোনো ডকুমেন্ট হোল্ডার ব্যবহার করলে তা অবশ্যই পর্দার কাছাকাছি রাখতে হবে।

vi. মাথার ওপরকার বাতির আলো এবং টেবিলের বাতির আলো এমনভাবে কমিয়ে দিতে হবে তা যেন চোখে বা কম্পিউটারের পর্দায় না পড়ে।

vii. প্রতি ১০ মিনিট পর পর দূরের কোনো বস্তুর দিকে তাকাবে, এতে চোখ আরামবোধ করবে।

viii. মাঝে মাঝেই চোখের পলক ফেলবে।

উপরিউক্ত নিয়মাবলি অনুসরণের মাধ্যমে সিয়ামের সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব হবে।

## মডেল টেস্ট- ০২

# বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| উত্তর | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | N | ২ | N | ৩ | N | ৪ | N | ৫ | L | ৬ | M | ৭ | K | ৮ | L | ৯ | M | ১০ | K | ১১ | L | ১২ | L | ১৩ | K | ১৪ | K | ১৫ | N |
| | ১৬ | N | ১৭ | L | ১৮ | N | ১৯ | N | ২০ | M | ২১ | N | ২২ | K | ২৩ | L | ২৪ | L | ২৫ | K | ২৬ | N | ২৭ | M | ২৮ | N | ২৯ | M | ৩০ | K |

# সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▸ ০১**

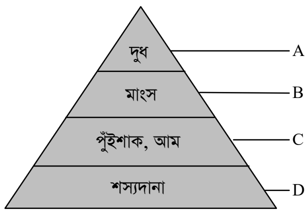


ক. রাফেজ কী? ১

খ. খাদ্যপ্রাণ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. খাদ্য পিরামিডের খাদ্যগুলোর বিকল্প খাদ্য ব্যবহার করে এক দিনের দুপুরের সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি কর। ৩

ঘ. D চিহ্নিত খাদ্য উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-১ এর আলোকে]

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাফেজ মূলত সেলুলোজ দিয়ে তৈরি উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর। শস্যদানা, ফলমূল এবং সবজির অপাচ্য তন্তুময় অংশই হলো রাফেজ।

**খ** খাদ্যে পরিমাণমতো শর্করা, আমিষ এবং স্নেহ পদার্থ থাকার পরেও জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য বিশেষ এক ধরনের খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন হয়। ঐ খাদ্য উপাদানকে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বলে। খাদ্যপ্রাণ সাধারণত খাদ্যে অতি সামান্য পরিমাণে থাকে এবং বিপাক ক্রিয়ায় উৎসেচকের সাথে কো-এনজাইম হিসেবে কাজ করে। খাদ্যপ্রাণ প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও শরীর সুস্থ রাখার জন্য অপরিহার্য।

**গ** সুষম খাদ্য বলতে কোনো নির্দিষ্ট খাদ্যবস্তুকে বোঝায় না। সুষম খাদ্য হলো বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর এমন সমাহার, যার মধ্যে খাদ্য উপাদানের সবগুলোই পরিমাণমতো থাকে এবং যা থেকে স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য উপযুক্ত ক্যালরি পাওয়া যায়।

নিচে খাদ্য পিরামিডের খাদ্যগুলোর বিকল্প খাদ্য ব্যবহার করে এক দিনের দুপুরের সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করা হলো-

| পিরামিডের খাদ্য | উৎস | বিকল্প খাদ্য |
|---|---|---|
| A-এর খাদ্য | স্নেহ ও আমিষ | মাখন |
| B-এর খাদ্য | আমিষ | মাছ/ডিম |
| C-এর খাদ্য | ভিটামিন ও খনিজ লবণ | লালশাক, পেঁপে |
| D-এর খাদ্য | শর্করা | ভাত |

**ঘ** খাদ্য পিরামিডে D চিহ্নিত খাদ্য উপাদানটি হলো শস্যদানা যা শর্করা জাতীয় খাদ্য।

শর্করা হলো মানুষের প্রধান খাদ্য। শর্করা দেহে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাপ শক্তি উৎপাদন করে। কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে শর্করা গঠিত। পুষ্টিতেও শর্করার ভূমিকা রয়েছে। জীবদেহে বিপাকীয় কাজের জন্য যে শক্তি লাগে তা শ্বসনের সময় কার্বোহাইড্রেট খাদ্য জারণের ফলে উৎপন্ন হয়। শস্যদানা হতে প্রাপ্ত প্রতিগ্রাম শর্করা জারণে ৪.১ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। সেলুলোজ একটি অপাচ্য প্রকৃতির শর্করা। এটি আঁশযুক্ত খাদ্য যা কোষ্ঠকাঠিন্য রোধক। এছাড়া শর্করা থেকে প্রোটিন ও ফ্যাট সংশ্লেষ হয়। খাদ্যে শর্করার অভাব ঘটলে স্নেহ জাতীয় পদার্থের দহন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে না ফলে শরীরে এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়ে কিটোসিস রোগ হয়। আবার শর্করার অভাবে দেহের ওজন কমে যায়, ক্ষুধা বেড়ে যায়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, D চিহ্নিত খাদ্য উপাদানটি অর্থাৎ শর্করা শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ▸ ০২** হিমেলদের গ্রামের পাশ দিয়ে একটি ছোট নদী বয়ে গেছে। নদীর পাড়ে কিছু শিল্প কারখানা থাকায় নদীর পানি সবসময় ঘোলাটে থাকে। পানিতে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থ ভাসমান থাকে। নদীর পানির pH পরীক্ষা করে দেখা গেছে ৫ এর কম।

ক. লোনা পানি কাকে বলে? ১

খ. নদীতে বাঁধ নির্মাণ পানির জন্য হুমকি হতে পারে কেন? ২

গ. হিমেলদের গ্রামের পাশের নদীর পানি কীভাবে দূষণমুক্ত রাখা যাবে? ৩

ঘ. উদ্দীপকের নদীতে জলজ প্রাণী বসবাসের উপযুক্ত কি না- মতামত দাও। ৪

[অধ্যায়-২ এর আলোকে]

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যে পানিতে লবণের পরিমাণ বেশি তাকে লোনা পানি বলে।

**খ** বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীতে বাঁধ নির্মাণ আমাদের পানিসম্পদের জন্য হুমকি হতে পারে। কারণ নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দেওয়ার ফলে এদের শাখা-প্রশাখায় পানি প্রবাহ মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়ে। ফলে নদীগুলো শুকিয়ে যাবার ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

**গ** উদ্দীপকে হিমেলদের গ্রামের পাশের নদীর পানি যেভাবে দূষণমুক্ত রাখা যাবে তা নিচে আলোচনা করা হলো−

১. আবর্জনা ও নর্দমার জঞ্জালসমূহ নদীতে গড়িয়ে পড়ার আগে শোধন করতে হবে।
২. জীবজন্তুর মৃতদেহ পানিতে পড়ে পানি যেন দূষিত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
৩. শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ পানিতে পড়ার আগেই তা দূষণ মুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪. প্লাস্টিক, পলিথিন রাবার জাতীয় পদার্থ নদীতে ফেলা যাবে না।
৫. নৌযানের যাত্রীরা যাতে নদীতে আবর্জনা না ফেলে সেজন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।
৬. নদীতে যেসব আবর্জনা জমা হয়েছে তা সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. নদীতে যে কোনো আবর্জনা ফেলা রোধ করতে কঠোর আইন প্রণয়ন করে তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলে হিমেলদের গ্রামের পাশের নদীর পানি দূষণ বহুকাংশে দূষণমুক্ত রাখা যাবে।

**ঘ** উদ্দীপকে আলোচ্য নদীতে জলজ প্রাণী বসবাসের উপযুক্ত নয়। নিচে এর কারণ বিশ্লেষণ করা হলো−

জলজ প্রাণীর প্রধান আশ্রয়স্থল হলো পানি। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ড বজায় না থাকলে সে পানিতে জলজ প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। পানির গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হলো, পানি পরিষ্কার হওয়া এবং pH এর মান ৬−৮ এর মধ্যে থাকা। হিমেলদের গ্রামের নদীর পানিতে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থ ভাসমান দেখা যায় এবং pH এর মান ৫ এর কম। পানিতে বর্জ্য থাকায় সূর্যের আলো প্রবেশ করতে না পারায় জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং এতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদগুলো অক্সিজেন ও খাবারের অভাবে মারা যাচ্ছে। অন্যদিকে pH এর মান কম হওয়ার কারণে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী বেঁচে থাকা কষ্টকর হবে।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, যেহেতু হিমেলদের গ্রামের নদীর পানির গুরুত্বপূর্ণ দুটি মানদণ্ডই সঠিক নেই তাই নদীটি জলজ প্রাণী বসবাসের জন্য উপযুক্ত নয়।

**প্রশ্ন ▸ ০৩**

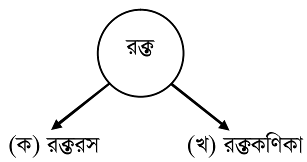


ক. রক্তকণিকা কী? ১
খ. সর্বজনীন গ্রহীতা বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' উপাদানটির কাজ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মানবদেহের সুস্থতার জন্য 'খ' উপাদানটির উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ− উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[অধ্যায়-৩ এর আলোকে]

**৩নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** রক্তরসের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন রকমের কোষই হলো রক্তকণিকা।

**খ** রক্তের যে গ্রুপধারী ব্যক্তি সকল গ্রুপের রক্ত গ্রহণ করতে পারে তাদেরকে সর্বজনীন গ্রহীতা বলে। O গ্রুপের প্লাজমায় অ্যান্টিবডি a ও অ্যান্টিবডি b উপস্থিত থাকে এবং AB গ্রুপের প্লাজমায় অ্যান্টিবডি a বা অ্যান্টিবডি b কোনোটাই থাকে না। AB গ্রুপের ব্যক্তিরা AB, A, B গ্রুপ ও O গ্রুপের দাতাদের রক্ত গ্রহণ করতে পারে। কারণ AB গ্রুপের অ্যান্টিবডি না থাকার কারণে A ও B রক্ত গ্রুপের অ্যান্টিজেন গ্রহীতার (AB) রক্তের সাথে কোনো বিক্রিয়া করে না। এ কারণে AB গ্রুপের ব্যক্তিদেরকে সর্বজনীন গ্রহীতা (Universal Recipient) বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের 'ক' উপাদানটি হলো রক্তরস। নিচে রক্তরসের কাজ ব্যাখ্যা করা হলো-

i. রক্তকণিকাসহ রক্তরসে দ্রবীভূত খাদ্যসার দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয়।
ii. টিস্যু থেকে বর্জ্য পদার্থ নির্গত করে রেচনের জন্য বৃক্কে পরিবহণ করে।
iii. শ্বসনের ফলে কোষে সৃষ্ট $CO_2$ কে বাইকার্বনেট হিসেবে ফুসফুসে পরিবহণ করে।
iv. রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরিবহণ করে।
v. হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশে বহন করে।
vi. রক্তের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে।

**ঘ** উদ্দীপকের রেখাচিত্রের 'খ' অংশটি রক্তকণিকা। মানবদেহে তিন ধরনের রক্তকণিকা রয়েছে। যেমন- লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা। এসব রক্তকণিকা মানবদেহের সুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করা হলো-

**লোহিত রক্তকণিকা :**

i. দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে।
ii. নিষ্কাশনের জন্য কিছু পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড টিস্যু থেকে ফুসফুসে বহন করে।
iii. হিমোগ্লোবিন রক্তের অম্ল-ক্ষারের সমতা বজায় রাখার জন্য বাফার হিসেবে কাজ করে।

**শ্বেত রক্তকণিকা :**

i. লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি গঠন করে এবং মনোসাইট ও নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে।
ii. ইওসিনোফিল ও বেসোফিল হিস্টামিন নামক পদার্থ নিঃসৃত করে দেহে এলার্জি প্রতিরোধ করে।
iii. বেসোফিল হেপারিন নিঃসৃত করে রক্তবাহিকায় রক্তের জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

**অণুচক্রিকা :**

i. শরীরের কোনো ক্ষতস্থান হতে রক্তক্ষরণ হলে অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। ফলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়।
ii. বিভিন্ন সংকোচনধর্মী পদার্থ ক্ষরণের মাধ্যমে রক্তবাহিকার সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত বন্ধে সাহায্য করে।
iii. রক্ত জালিকার ক্ষতিগ্রস্ত এন্ডোথেলিয়াম আবরণ পুনর্গঠনে অংশ নেয়।

রক্তকণিকাসমূহের উপরিউক্ত কর্মকাণ্ডগুলো যথাযথভাবে সম্পাদনের ফলেই মানবদেহ সুস্থ থাকে।

তাই বলা যায়, "মানবদেহের সুস্থতার জন্য রক্তকণিকার উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"— উক্তিটি যৌক্তিক ও যথার্থ।

**প্রশ্ন ▸ ০৪** আলতাফ সাহেবের স্ত্রী একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। আলতাফ চেয়েছিল তার একটি ছেলে সন্তান হোক। আশা পূর্ণ না হওয়ায় আলতাফ সাহেব তার স্ত্রীকে দোষারোপ করে তাকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

ক. RNA কী? ১
খ. টেস্টটিউব বেবি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সন্তান জন্মদানের জন্য আলতাফ সাহেবের কোন ক্রোমোজোমটি দায়ী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কন্যা সন্তান জন্মদানের জন্য আলতাফ সাহেবের স্ত্রী কোনোভাবেই দায়ী নয়− বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৪ এর আলোকে]

**৪নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** RNA হলো রাইবোনিউক্লিক এসিড যা পাঁচ কার্বনযুক্ত রাইবোজ শর্করা ও ফসফেট নির্মিত একটি মাত্র পার্শ্ব কাঠামোর দ্বারা গঠিত।

**খ** কৃত্রিম উপায়ে দেহের বাইরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে প্রাথমিক ভ্রূণ সৃষ্টি করে সেটি নারীদের জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে শিশুর জন্ম হলে তাকে টেস্টটিউব বেবি বলা হয়। নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান লাভের জন্য পর্যায়ক্রমে কতকগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ঘটিয়ে টেস্টটিউব বেবির জন্ম দেওয়া হয়। এগুলো হলো সক্ষম দম্পতি থেকে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ করে বিশেষ পালন মাধ্যমে প্রাথমিক ভ্রূণ উৎপাদন, উৎপাদিত ভ্রূণকে স্ত্রী জরায়ুতে প্রতিস্থাপন এবং প্রসূতির পরিচর্যা ও সন্তান লাভ।

**গ** কন্যা সন্তান জন্মদানের জন্য আলতাফ সাহেবের সেক্স ক্রোমোজোমের X নামক ক্রোমোজোমটি দায়ী। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো-

মানুষের জীবকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। এই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে লিঙ্গা নির্ধারণে সহায়তাকারী একজোড়া ক্রোমোজোম থাকে। যাকে সেক্স ক্রোমোজোম বলে। পুরুষের সেক্স ক্রোমোজেমে X ও Y একজোড়া ভিন্ন ক্রোমোজোম থাকে কিন্তু নারীদের সেক্স ক্রোমোজোমে দুটিই X অভিন্ন ক্রোমোজোম থাকে। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীদের সেক্স ক্রোমোজোম হলো যথাক্রমে XY ও XX। কোনো নারীর গর্ভধারণকালে পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোম X মিলিত হলে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অন্যদিকে পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোম Y এর সাথে নারীর সেক্স ক্রোমোজোম X মিলিত হলে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সন্তান মেয়ে না ছেলে হবে অর্থাৎ লিঙ্গা নির্ধারণে নারীর সেক্স ক্রোমোজোম X এর সাথে পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোম X না Y মিলিত হবে তার উপর নির্ভর করে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, কন্যা সন্তান জন্মদানের জন্য আলতাফ সাহেবের X নামক ক্রোমোজোমটি দায়ী।

**ঘ** কন্যা সন্তান জন্মদানের জন্য আলতাফ সাহেবের স্ত্রী কোনোভাবেই দায়ী নয়। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো-

মানুষের জীবকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। এই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে লিঙ্গা নির্ধারণে সহায়তাকারী এক জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। যাকে সেক্স ক্রোমোজোম বলে। পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোমে X ও Y একজোড়া ভিন্ন ক্রোমোজোম থাকে। অর্থাৎ পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোম হলো XY। আবার নারীদের সেক্স ক্রোমোজোমে দুটি X অভিন্ন ক্রোমোজোম থাকে। অর্থাৎ নারীদের সেক্স ক্রোমোজোম হলো XX। কোনো নারীর গর্ভধারণকালে পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোম X এর সাথে নারীর সেক্স ক্রোমোজোম X মিলিত হলে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অন্যদিকে পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোম Y এর সাথে নারী সেক্স ক্রোমোজোম X মিলিত হলে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ নারীর সেক্স ক্রোমোজোম অভিন্ন হওয়ায় পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোমের ভিন্নতার কারণে নবজাতক কন্যা বা পুত্র সন্তান হিসেবে জন্মলাভ করে।

আলতাফ সাহেবের স্ত্রীর ক্ষেত্রে গর্ভধারণকালে ডিম্বাণু তার স্বামীর X ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শুক্রাণুর সাথে মিলন ঘটে। ফলে পরপর দুইবারই কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে আলতাফ সাহেবের স্ত্রীর কোনো ভূমিকা না থাকায় তার মন খারাপ করার কিছু নেই। এটি প্রকৃতি নির্ধারণ করে যা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত।

সুতরাং বলা যায়, কন্যা সন্তান জন্মদানের জন্য আলতাফ সাহেবের স্ত্রীর কোনো ভূমিকা নেই।

**প্রশ্ন ▶ ০৫** মিরাকে একটু দূরে বই রেখে পড়তে হয়। আশা অধিক সময় ধরে কম্পিউটারে কাজ করে, ইদানীং তার চোখে সমস্যা হয়েছে। উভয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার মিরার সমস্যাটি চিহ্নিত করেন এবং আশাকে ডাক্তার চোখ ভালো রাখার জন্য পরামর্শ দেন।

ক. আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে? ১
খ. পড়ার সময় পর্যাপ্ত আলো প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিরার সমস্যাটি কী? তার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আশাকে ডাক্তারের দেওয়া পরামর্শগুলো ব্যাখ্যা কর। ৪

[অধ্যায়-৫ এর আলোকে]

## ৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আলো যখন একটি স্বচ্ছ মাধ্যমে থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে লম্বভাবে আপতিত না হয়ে বাঁকাভাবে আপতিত হয়, তখন মাধ্যম দুটির বিভেদতলে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তন করার এ ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।

**খ** আবছা বা অপর্যাপ্ত আলোতে বই পড়লে পড়া স্পষ্ট বুঝা যায় না। এজন্য বই চোখের খুব কাছে এনে পড়তে হয় যেটি চোখের জন্য ক্ষতিকর। এতে চোখের উপর চাপ পড়ে। অনেক সময় চোখের বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব কারণে চোখ সুস্থ রাখার জন্য পড়ার সময় পর্যাপ্ত আলো প্রয়োজন।

**গ** মিরার সমস্যাটি হলো কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায় না। অর্থাৎ সে দীর্ঘদৃষ্টিজনিত ত্রুটিতে আক্রান্ত। এরূপ চোখের সমস্যার ক্ষেত্রে চোখের নিকট বিন্দুটি 25 সেন্টিমিটার হতে খানিকটা দূরে অবস্থান করে। মিরার চোখের এ ত্রুটি দুটি কারণে ঘটতে পারে। যথা–

১. চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা হ্রাস পেলে অথবা চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে গেলে।
২. কোনো কারণে অক্ষিগোলকের ব্যাসার্ধ হ্রাস পেলে।

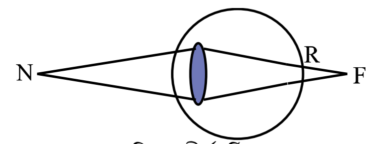

চিত্র : দীর্ঘদৃষ্টি

এর ফলে দূর থেকে আসা আলো সঠিকভাবে চোখের রেটিনাতে প্রতিবিম্ব তৈরি করলেও কাছাকাছি বিন্দু থেকে আসা আলোকরশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনার উপরে না হয়ে পিছনে (F) বিন্দুতে মিলিত হয়। ফলে চোখ কাছের বস্তু দেখতে পায় না।

**ঘ** আশাকে ডাক্তার দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গা চোখ যথাযথ যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে ভালো রাখার পরামর্শ দেন। তার দেওয়া পরামর্শগুলো নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

আশার চোখ ভালো রাখতে সঠিক পুষ্টি গ্রহণ, সঠিক জীবনধারাণ পদ্ধতি অনুসরণ এবং আবছা বা অপর্যাপ্ত আলোর ব্যবহার পরিহার করতে হবে। ভিটামিন এ, সি ও ই সমৃদ্ধ খাবার, ফ্যাটি এসিডুক্ত খাবার, জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাদ্য, গাঢ় সবুজ শাকসবজি ও বিভিন্ন ফল খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে। তার চোখের সঠিক পুষ্টির জন্য গাজর, মাছ, ব্রকলি, গম, মিষ্টি কুমড়া, হলুদ (যেমন- পাকা পেঁপে, আম) ফল ইত্যাদি বেশি করে খেতে হবে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর শরীরের মতো চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই চোখকে যখন ক্লান্ত মনে হবে তখন চোখের উপর চাপ না পড়ে সেজন্য বিশ্রাম নিতে হবে। তার চোখকে পুনরায় সতেজ করতে নির্ধারিত সময়ে ঘুমাতে হবে এবং ঘুম পর্যাপ্ত হতে হবে। আবছা বা অপর্যাপ্ত আলোতে কোনো কাজ করা যাবে না। এজন্য ঘরের আলো পর্যাপ্ত রাখতে হবে যেন দেখতে অসুবিধা না হয়। নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে এবং বিরতি দিয়ে তাকে টেলিভিশন দেখা বা কম্পিউটার ব্যবহার করতে হবে। একটানা কম্পিউটারের দিকে না তাকিয়ে প্রতি ১০ মিনিট পর পর কিছুক্ষণের জন্য দূরের কোনো কিছুর দিকে তাকাতে হবে। এতে তার চোখ আরাম বোধ করবে। ধূমপান চোখের ক্ষতি করে। তাই তাকে ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে।

উপরিউক্ত পরামর্শগুলো মেনে চললে আশা তার চোখের সমস্যা থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে।

**প্রশ্ন ▶ ০৬** সাইফুল ফাইব্রেয়ন নামক এক ধরনের প্রোটিন জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি কাপড়ের শার্ট কিনলো। এটি ক্রয়ের আগে সে আরেকটি শার্ট ব্যবহার করেছে যা তুলার আঁশ থেকে তৈরি।

ক. পুল্ড উল কাকে বলে? ১

খ. তুলার ব্লেন্ডিং এবং মিক্সিং করা হয় কেন? ২

গ. সাইফুলের নতুন কেনা শার্টের কাপড়ের সুতা তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাইফুলের উল্লিখিত দুটি শার্টের মধ্যে ব্যবহারের দিক দিয়ে কোনটি বেশি আরামদায়ক? বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

[অধ্যায়-৬ এর আলোকে]

### ৬নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মৃত বা জবাই করা মেষ থেকে যে পশম তৈরি করা হয় তাকে পুল্ড উল বলে।

**খ** গুণে এবং মানে ঠিক একই রকম তুলা সবসময় পাওয়া সম্ভব হয় না। বেল বা গাঁট থেকে বিভিন্ন রকম তুলার মিশ্রণ তৈরি করা হয়। বিভিন্ন রকম তুলার মিশ্রণ না করলে সুতার মান একই রকম হয় না। একেক সময় একেক রকম সুতা তৈরি হবে, কখনো ভালো, কখনো মন্দ হবে। এছাড়া বিভিন্ন রকম তুলা মিশিয়ে সুতা তৈরি করলে উৎপাদন খরচও কম হয়। এসব কারণে তুলার ব্লেন্ডিং এবং মিক্সিং করা হয়।

**গ** সাইফুলের নতুন কেনা শার্টের কাপড়ের সুতা হলো রেশম সুতা। নিচে রেশম সুতা তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করা হলো–

রেশম পোকা থেকে এক ধরনের পরিণত গুটি বা কোকুন প্রথমে সাবান পানিতে লোহার করাইয়ে সিদ্ধ করা হয়। এতে কোকুনের ভেতরকার রেশম পোকা মরে যায় এবং গুটি কেটে বের হয়ে রেশমের গুটি নষ্ট করতে পারে না। সিদ্ধ করা কোকুন বেশ নরম হয়। এরপর কোকুনের ওপর থেকে একটি খোসা ছাড়িয়ে ফেলা হয়। খোসা ছাড়ানোর পর কোকুন থেকে তন্তুর প্রান্ত বা নাল পাওয়া যায়। তারপর প্রাপ্ত তন্তুর প্রান্তটি ধীরে ধীরে টেনে লম্বা আঁশ বের করতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত মিহি বা চিকন সুতার জন্য ৫-৭টি এবং মাঝারি বা মোটা সুতার জন্য ১৫-২০ টি কোকুনের প্রান্ত বা নাল একত্রে করে চরকার সাহায্যে ফেটি করা হয়। সংগৃহীত তন্তুর আঁশগুলো পরস্পর আঠালোভাবে লেগে একগাছি সুতায় পরিণত হয়। এভাবে রেশম পোকা থেকে তন্তু সংগ্রহ করে রেশম সুতা উৎপাদন করা হয়।

**ঘ** সাইফুলের কেনা দুটি শার্ট হলো রেশম সুতার ও সুতির কাপড়ের তৈরি। ব্যবহারে আরামদায়কের বিবেচনায় এ দুটি শার্টের কাপড়ের বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক নিচে যুক্তিসহ মতামত দেওয়া হলো–

i. প্রথমত সুতি কাপড় শুধুমাত্র গরমের দিনে পরা আরামদায়ক। কিন্তু রেশমি কাপড় সকল ঋতুতে ব্যবহার করা যায়।

ii. রেশমি কাপড় রেশম তন্তু থেকে তৈরি হয়। আর রেশম মূলত ফাইব্রেয়ন নামক একপ্রকার প্রোটিন জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। যা শরীরে আরামদায়ক অনুভূতির সৃষ্টি করে। কিন্তু সুতি কাপড় উদ্ভিদ তন্তু থেকে সংগ্রহ করা হয়। এতে প্রোটিন থাকে না।

iii. প্রতিনিয়ত সুতি কাপড় ইস্ত্রি করে পরতে হয়। কারণ এটি সংকোচনশীল। কিন্তু রেশমি কাপড় সংকোচনশীল নয়।

iv. সুতি কাপড় তেমন উজ্জ্বল হয় না। কিন্তু রেশমি কাপড় উজ্জ্বল ও বাহারি ডিজাইনের হয়ে থাকে।

অতএব রেশমের উপরিউক্ত বিভিন্ন গুণাগুণের জন্য রেশমের শার্ট সুতির শার্ট অপেক্ষা বেশি আরামদায়ক।

**প্রশ্ন ▶ ০৭** (i) $HCl + \boxed{A} \rightarrow NaCl + H_2O$

(ii) $CaCO_3 + \boxed{B} \rightarrow \boxed{C} + H_2O + CO_2$

ক. এসিডিটি কাকে বলে? ১

খ. খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. A কোন ধরনের যৌগ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৈনন্দিন জীবনে B ও C যৌগ দুটির মধ্যে কোনটি ব্যবহারের সময় অধিক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় এবং কেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৭ এর আলোকে]

### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের পরিমাণ বেড়ে গেলে পাকস্থলীতে ব্যথা অনুভূত হয়। এ অবস্থাকেই পাকস্থলীর এসিডিটি বলে।

**খ** খাওয়ার পরে সাধারণত আমাদের মুখে এসিডিয় অবস্থা তৈরি হয়। আর টুথপেস্ট বা টুথ পাউডার আমাদের নিত্যদিনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বস্তু যা ক্ষারীয়। তাই খাবার পর টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করলে দাঁত পরিষ্কার হয় এবং পেস্টের ক্ষার এসিডকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় ফলে দাঁতের ক্ষয়রোধ হয়। তাই খাবার পর দাঁত ব্রাশ করা প্রয়োজন।

**গ** উদ্দীপক অনুসারে,

(i) $HCl + \boxed{A} \longrightarrow NaCl + H_2O$ এই সমীকরণটি সম্পূর্ণ করে পাই,

$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$

এখানে A অর্থাৎ NaOH হলো ক্ষারীয় যৌগ। নিচে ক্ষারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো-

১. সকল ক্ষার পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত নির্দেশকের রং পরিবর্তন করে। যেমন- NaOH লাল লিটমাস কাগজকে নীল করে।

২. ক্ষার পানিতে হাইড্রোক্সাইড আয়ন ($OH^-$) উৎপন্ন করে। যেমন- $NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$

৩. এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে নিরপেক্ষ লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। $H_2SO_4 + NaOH \longrightarrow Na_2SO_4 + H_2O$

৪. ক্ষারের pH সর্বদা 7 অপেক্ষা বেশি হয়। NaOH এর pH 7 থেকে বেশি।

**ঘ** উদ্দীপকে (i) ও (ii) নং সমীকরণ সম্পূর্ণ করে পাই,

(i) $HCl + \boxed{A} \longrightarrow NaCl + H_2O$

$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$

(ii) $CaCO_3 + \boxed{B} \longrightarrow \boxed{C} + H_2O + CO_2$

$CaCO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$

উদ্দীপকে B যৌগটি হলো $H_2SO_4$ যা একটি শক্তিশালী এসিড এবং C যৌগটি হলো $CaSO_4$ যা একটি লবণ। দুটি যৌগের মধ্যে B যৌগটি ব্যবহারে আমাদের অধিক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। $H_2SO_4$ একটি শক্তিশালী এসিড, যা মানবদেহের জন্য যেমন- মারাত্মক ক্ষতিকর, তেমনি আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় এবং নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রেরও অনেক ক্ষতিসাধন করে। শরীরের কোথাও এটি লাগলে সেই স্থান পুড়ে যায় ও ক্ষত সৃষ্টি হয়। কাপড়ে লাগলে কাপড়ও পুড়ে যায় এবং ছিদ্র হয়ে যায়। একইভাবে ধাতব পদার্থসমূহ এসিডের সংস্পর্শে এলে তাও ক্ষয় হয়ে যায়।

অতএব, $H_2SO_4$ ব্যবহারে আমাদেরকে অধিক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কোনো কারণে গায়ে বা কাপড়ে লাগলে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

**প্রশ্ন ▸ ০৮**

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| প্রচুর পানি ধারণ করতে পারে | পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম | B-এর চেয়ে পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি | পানি ধারণ ক্ষমতা ভালো এবং দ্রুত নিষ্কাশনও করতে পারে |

ক. কয়লা কী? ১
খ. হিউমাস বলতে কী বুঝায়? ২
গ. B-এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. A, B, C ও D এর মধ্যে কোন মাটিতে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান বেশি থাকে? বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৮ এর আলোকে]

**৮নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** কয়লা হলো কালো বা বাদামি কালো রঙের এক ধরনের পাললিক শিলা, যার মূল উপাদান হলো কার্বন।

**খ** মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ হিউমাস নামে পরিচিত। এটি অ্যামিনো এসিড, প্রোটিন, চিনি, অ্যালকোহল, চর্বি, তেল, লিগনিন, ট্যানিন ও অন্যান্য অ্যারোমেটিক যৌগের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ জটিল পদার্থ। এটি দেখতে অনেকটা কালচে রঙের হয়। মৃত গাছপালা ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে হিউমাস তৈরি হয়।

**গ** উদ্দীপকের ছকে উল্লিখিত B হলো বালু মাটি। নিচে বালু মাটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো-

বালু মাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এদের পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। এ মাটি বিদ্যমান কণার আকার সবচেয়ে বড় থাকে। ফলে কণাগুলোর মধ্যে ফাঁকা জায়গা অনেক বেশি থাকে। এ মাটিতে অতি ক্ষুদ্র শিলা ও খনিজ পদার্থ থাকে। বালু মাটিতে হিউমাস থাকলে চাষাবাদের জন্য সহজসাধ্য হয়। পানি ধারণ ক্ষমতা কম হওয়ায় এ মাটিতে পানি দিলে তা দ্রুত নিষ্কাশিত হয়। ফলে এ মাটি চাষাবাদের জন্য তেমন উপযোগী নয়। বৃষ্টিপাত অঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে বালু মাটি চাষাবাদের জন্য উপযোগী হয়ে উঠতে পারে।

**ঘ** উদ্দীপকের ছকে প্রদত্ত A, B, C ও D হলো যথাক্রমে কাদা মাটি, বালু মাটি, পলি মাটি ও দোআঁশ মাটি। এদের মধ্যে পলি মাটিতে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান বেশি থাকে। নিচে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হলো-

কাদা মাটির কণাগুলো সূক্ষ্ম হওয়ায় কণাগুলোর মধ্যকার রন্ধ্র খুব ছোট ও সরু হয়। তাই পানি সহজে নিষ্কাশিত হয় না। এর ফলে সামান্য বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং উদ্ভিদ বা ফলাদির মূলে পচন ধরে। অন্যদিকে বালু মাটির কণার আকার বড় থাকে। ফলে কণার মধ্যে ফাঁকা জায়গা থাকায় বায়বায়ন বেশি হলেও এ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হওয়ায় উদ্ভিদে পানি স্বল্পতা দেখা দেয়। আবার দোঁআশ মাটি বালু, পলি ও কাদা মাটির সমন্বয়েই তৈরি হয়। এ মাটির একদিকে যেমন পানি ধারণ ক্ষমতা ভালো আবার প্রয়োজনের সময় নিষ্কাশনও দ্রুত ঘটে। তাই এতে ফসলের ভালো চাষাবাদ হয়। অপরদিকে, পলি মাটির কণাগুলো বালু মাটির কণার তুলনায় আকারে ছোট হয়। ফলে বালু মাটির তুলনায় এর পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। এই মাটির কণাগুলো ছোট হওয়ায় এরা পানিতে ভাসমান আকারে থাকে এবং এক পর্যায়ে পানির নিচে থাকা জমিতে পলির আকারে জমা পড়ে। এ মাটিতে জৈব পদার্থ ও খনিজ পদার্থ থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'C' অর্থৎ পলি মাটিতে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান বেশি থাকে।

**প্রশ্ন ▸ ০৯** রাকিব সাহেব নির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরি করেন। এটি জীবপ্রযুক্তি নামে পরিচিত।

ক. ক্লোনিং কী? ১
খ. DNA টেস্ট বলতে কী বুঝায়? ২
গ. রাকিব সাহেবের অনুসৃত ধাপগুলো বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ঔষধ শিল্পে উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রযুক্তির গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

[অধ্যায়-১১ এর আলোকে]

**৯নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ক্লোনিং হলো অযৌন অজ্ঞাজ জননের দ্বারা মাতৃজীবের অনুরূপ একটি বা একদল জীবের উদ্ভব ঘটানোর প্রক্রিয়া ।

**খ** DNA টেস্ট এক ধরনের বিশেষ পরীক্ষা যার সাহায্যে সন্তান ও পিতামাতার DNA এর প্রোফাইল দেখে সন্তানের পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়। গবেষণাগারে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে প্রোফাইলসমূহ প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত সন্তানের DNA প্রোফাইল চিত্রের সাথে যদি পিতামাতার প্রত্যেকের প্রোফাইল চিত্রের ৫০% মিল পাওয়া যায় তবে তাদেরকে ঐ সন্তানের প্রকৃত পিতামাতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

**গ** উদ্দীপকের বর্ণনানুযায়ী রাকিব সাহেব রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরি করেন। নিচে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরিতে অনুসৃত ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো-

i. প্রথমে দাতা জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত জিনসহ ডিএনএ অণু পৃথক করা হয়। এরপর এই জিনের বাহক হিসেবে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড ডিএনএ পৃথক করা হয়।
ii. এ ধাপে প্লাজমিড ডিএনএ এবং দাতা ডিএনএ এক বিশেষ ধরনের এনজাইম দ্বারা খণ্ডিত করা হয়। দাতা ডিএনএ-এর এসব খণ্ডের কোনো একটিতে কাঙ্ক্ষিত জিনটি থাকে।
iii. এ পর্যায়ে লাইগেজ নামক এক ধরনের এনজাইম দ্বারা দাতা ডিএনএকে প্লাজমিড ডিএনএ-এর কর্তিত প্রান্ত দুটির মাঝখানে স্থাপন করা হয়। লাইগেজ এখানে আঠার মতো কাজ করে। ফলে নির্দিষ্ট জিনসহ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্লাজমিড সৃষ্ট হয়। এ রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডগুলোই দাতা ডিএনএ এর বিভিন্ন খণ্ডিত অংশ বহন করে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি হলো জীবপ্রযুক্তি। ঔষধ শিল্পে জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

i. **ভ্যাকসিন উৎপাদন :** বর্তমানে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাপকভাবে সংক্রামক রোগের (যেমন- পোলিও, যক্ষ্মা, হাম, বসন্ত ইত্যাদি) প্রতিষেধক টিকা উৎপাদন করা হয়েছে।
ii. **ইন্টারফেরন উৎপাদন :** জিন প্রকৌশল প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিক ইন্টারফেরন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এটি হেপাটাইটিস চিকিৎসায় এবং ক্যানসারের প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।
iii. **হরমোন উৎপাদন :** বিভিন্ন হরমোন যেমন– ডায়াবেটিস রোগের ইনসুলিন বা মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি হরমোন ইত্যাদি উৎপাদন জীবপ্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক।
iv. **অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন :** জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কম সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করা হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পেনিসিলিন ও সেফালোস্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক।
v. **এনজাইম উৎপাদন :** পরিপাক সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধের উপাদান হিসেবে কিছু এনজাইম, যেমন- অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজ ও লাইপেজ, পেঁপে থেকে প্যাপেইন, বটগাছ থেকে কৃমি রোগে ব্যবহৃত ফাইসন গবাদিপশুর প্লাজমা থেকে থ্রম্বিন রক্তপাত বন্ধে ব্যবহৃত হয় এবং ক্ষত নিরাময়ে ট্রিপসিন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। জৈবপ্রযুক্তির কল্যাণে এসব এনজাইম উৎপাদিত ও বাজারজাত হচ্ছে।

vi. **ট্রান্সজেনিক প্রাণী থেকে ঔষধ আহরণ :** ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাণীগুলোর দুধ, রক্ত ও মূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ আহরণ করা হয় যা মলিকুলার ফার্মিং নামে পরিচিত।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, চিকিৎসাসেবাকে মানুষের দ্বারে পৌঁছে দিতে ঔষধ শিল্পে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

**প্রশ্ন ▸ ১০** আদৃতাদের বাসার কাপড় ইস্ত্রি বাবদ লন্ড্রী খরচ দিতে হয় মাসিক ২২০ টাকা। সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য আদৃতার বাবা একটি বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি কিনে আনলেন যার গায়ে 1000W - 220 V লেখা আছে। এটি প্রতিদিন ১৫ মিনিট চালানো হয়। উল্লেখ্য প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ ৫.০০ টাকা।

ক. ব্যাটারি কী? ১
খ. তড়িৎ প্রলেপন বলতে কী বুঝায়? ২
গ. ইস্ত্রি ব্যবহারে মাসিক ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. আদৃতার বাবা বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে পেরেছিলেন কি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-১২ এর আলোকে]

### ১০নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ব্যাটারি হলো একাধিক তড়িৎ কোষের সমন্বয়।

**খ** তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধাতুর ওপর সুবিধামতো অন্য কোনো ধাতুর প্রলেপ দেওয়াকে তড়িৎ প্রলেপন বলে। সাধারণত তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতু দ্বারা তৈরি জিনিসকে জলবায়ু থেকে রক্ষা এবং সুন্দর দেখানোর জন্য এদের ওপর সোনা, রুপা, নিকেল ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। যে ধাতুর উপর প্রলেপ দিতে হবে সে ধাতুকে ভোল্টামিটারের ক্যাথোড এবং যে ধাতু দ্বারা প্রলেপ দিতে হবে সে ধাতুকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

**গ** উদ্দীপক হতে পাই,

বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির ক্ষমতা = ১০০০ ওয়াট

$$\text{দৈনিক ব্যয়িত সময়} = ১৫ \text{ মিনিট} = \frac{১৫}{৬০} \text{ ঘণ্টা}$$

$$\text{আমরা জানি, ব্যয়িত শক্তি} = \frac{\text{ক্ষমতা} \times \text{সময়}}{১০০০} \text{ কিলোওয়াট-ঘণ্টা}$$

$$= \frac{১০০০ \times \frac{১৫}{৬০} \times ৩০}{১০০০} \text{ কিলোওয়াট-ঘণ্টা}$$

$$= \frac{১৫}{৬০} \times ৩০ \text{ কিলোওয়াট-ঘণ্টা} = ৭.৫ \text{ ইউনিট।}$$

অতএব, ইস্ত্রি ব্যবহারে মাসিক ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ ৭.৫ ইউনিট।

**ঘ** উদ্দীপকের তথ্য মতে, আদৃতার বাবার মাসিক লন্ড্রী খরচ ছিল ২২০ টাকা।

'গ' হতে, ইস্ত্রির জন্য ব্যয়িত শক্তি = ৭.৫ ইউনিট

প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বাবদ খরচ ৫ টাকা হলে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির জন্য ব্যয়িত তড়িৎ খরচ = (৭.৫ × ৫) টাকা = ৩৭.৫ টাকা

∴ মাসিক বিল সাশ্রয়ের পরিমাণ = (২২০ - ৩৭.৫) টাকা = ১৮২.৫ টাকা

অতএব, গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায়, আদৃতার বাবা বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে পেরেছিলেন।

**প্রশ্ন ▸ ১১** আনোয়ার হোসেন তার ফার্মে ফ্যাক্স ও ইন্টারনেটে কাজ করেন। পূর্বে ফ্যাক্স বেশি ব্যবহার করলেও এখন তিনি ইন্টারনেট বেশি ব্যবহার করেন।

ক. কম্পিউটার শব্দের অর্থ কী? ১
খ. যোগাযোগের নীতিমালা বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের ১ম যন্ত্রটি কীভাবে কাজ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আনোয়ার হোসেনের ব্যবহৃত দ্বিতীয় মাধ্যমটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে– বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-১৩ এর আলোকে]

### ১১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কম্পিউটার শব্দের অর্থ গণক বা হিসাবকারী।

**খ** যোগাযোগের জন্য প্রেরক ও গ্রাহকের উপস্থিতি প্রয়োজন। এ যোগাযোগ অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে কয়েকটি নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয়। এসব নিয়মনীতিকে যোগাযোগের মৌলিক নীতিমালা বলে। যোগাযোগের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে রয়েছে প্রেরক ও গ্রাহকের উপস্থিতি, যোগাযোগের ভাষার সঠিক ও তথ্য বিনিময় সৌজন্যবোধ এবং যোগাযোগের তথ্য, সংকেত বা ভাষার বোধগম্যতা ইত্যাদি।

**গ** উদ্দীপকের ১ম যন্ত্রটি হলো ফ্যাক্স মেশিন। নিচে ফ্যাক্স মেশিনের কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো-

ফ্যাক্স মেশিন একই সাথে একটি ডকুমেন্টের কপি পাঠাতে পারে এবং এই মেশিনে পাঠানো একটি কপিকে প্রিন্ট করে দিতে পারে। ফ্যাক্স মেশিনে যখন একটি ডকুমেন্ট দেওয়া হয়, তখন সেখানে উজ্জ্বল আলো ফেলা হয়। এ সময় ডকুমেন্টের কালো অংশ থেকে কম এবং সাদা অংশ থেকে বেশি আলো প্রতিফলিত হয়, সেই তথ্যগুলো সংরক্ষণ করে ডকুমেন্টটির কপিকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তরিত করে টেলিফোন লাইন দিয়ে পাঠানো হয়।

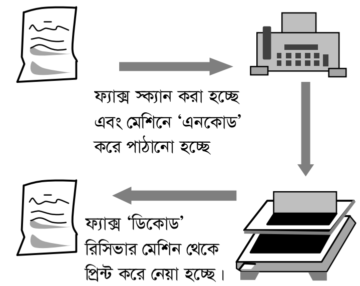


চিত্র : ফ্যাক্স মেশিন ও তার কার্যক্রম

টেলিফোন লাইনের অন্য প্রান্তে ফ্যাক্স মেশিনটি তার কাছে পাঠানো ডকুমেন্টের কপিটিকে একটি প্রিন্টারে প্রিন্ট করে দেয়।

**ঘ** আনোয়ার হোসেনের ব্যবহৃত দ্বিতীয় মাধ্যমটি হলো ইন্টারনেট। ইন্টারনেট আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো-

i. ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোনো সময় অনলাইন লাইব্রেরির লক্ষ লক্ষ বইপুস্তক জার্নাল ও ম্যাগাজিনের সন্ধান পাওয়া যায়।
ii. অনলাইন লাইব্রেরির বই বা ম্যাগাজিন প্রয়োজনীয় সময়ে পাঠ করতে অথবা ডাউনলোড করে ছেপে সংগ্রহ করে রাখা যায়।
iii. ইন্টারনেটের মাধ্যমে বন্ধু-বান্ধব, অফিসকর্মী ও আত্মীয় স্বজনের সাথে যখন তখন আড্ডা দেওয়া বা চ্যাটিং করা যায়।
iv. অবসর সময়ে চলচ্চিত্র দেখা যায় বা রেডিও শোনা যায়।
v. কাউন্টারে দীর্ঘলাইনে দাঁড়িয়ে ভোগান্তি এড়াতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাস, ট্রেন ও বিমানের টিকিট সহজেই বুকিং করা যায়।
vi. ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে ই-কমার্স এবং ব্যাংক অর্থ লেনদেনের আন্তঃযোগাযোগ কাজে ই-ব্যাংকিং করা যায়।
vii. সরকারি ও বেসরকারি চাকরির আবেদন করা এবং বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল জানা যায়।
viii. সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।

অতএব উপরের আলোচনা হতে বলা যায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## মডেল টেস্ট- ০৩

# বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| উত্তর | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | M | ২ | M | ৩ | L | ৪ | N | ৫ | L | ৬ | N | ৭ | L | ৮ | K | ৯ | N | ১০ | L | ১১ | L | ১২ | L | ১৩ | K | ১৪ | L | ১৫ | M |
| | ১৬ | N | ১৭ | M | ১৮ | N | ১৯ | K | ২০ | L | ২১ | N | ২২ | M | ২৩ | M | ২৪ | N | ২৫ | M | ২৬ | M | ২৭ | M | ২৮ | N | ২৯ | K | ৩০ | N |

# সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▸ ০১**

| | |
|---|---|
| A | শস্যদানার তেল, সূর্যমুখীর বীজ তেল, লেটুস পাতা। |
| B | আমলকী, লেবু, টমেটো, পুদিনা পাতা। |
| C | আলু, ধান, ভুট্টা, চিনি। |

ক. টক্সিন কাকে বলে? ১

খ. আঁশ জাতীয় খাদ্য দেহের জন্য উপকারী কেন? ২

গ. 'C' জাতীয় খাদ্যের পুষ্টিগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাস্থ্য সুরক্ষায় 'A' ও 'B' জাতীয় খাদ্যের প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-১ এর আলোকে]

**১নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া খাদ্য নষ্ট করে যে বিষাক্ত উপাদান তৈরি করে তাকে টক্সিন বলে।

**খ** আঁশ জাতীয় খাদ্য মূলত দীর্ঘ তন্তুময় সেলুলোজ জাতীয় উদ্ভিজ্জ অংশ। এটি দেহে কোনো পুষ্টি না যোগালেও কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদরোগ ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। শরীর থেকে অপাচ্য খাদ্য নিষ্কাশনে এবং অতিরিক্ত চর্বি কমাতে আঁশ জাতীয় খাবার সাহায্য করে। এছাড়া রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাদ্য পানি শোষণ করে ও মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। তাই আঁশ জাতীয় খাদ্য দেহের জন্য উপকারী।

**গ** উদ্দীপকে প্রদর্শিত 'C' জাতীয় খাদ্যগুলো হলো শর্করা জাতীয় খাদ্য। নিচে শর্করা জাতীয় খাদ্যের পুষ্টিগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো :
শরীরে পুষ্টি সাধনের জন্য মানুষের প্রধান খাদ্য হচ্ছে শর্করা। খাদ্যের এ উপাদানটি শরীরের কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং তাপ শক্তি উৎপাদন করে। বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য শ্বসন প্রক্রিয়ায় বায়ু থেকে আমরা যে অক্সিজেন গ্রহণ করি তা ফুসফুসে আমাদের রক্তের সাথে মিশে যায়। রক্তের লোহিত কণিকা এই অক্সিজেন আমাদের শরীরের কোষে পৌঁছে দেয় যা শর্করার উৎস গ্লুকোজের সাথে বিক্রিয়া করে তাপশক্তি উৎপন্ন করে। এই তাপ শক্তি আমাদের সকল শক্তির উৎস। জীবদেহে বিপাকীয় কাজের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় সেটি শর্করা জাতীয় খাদ্য জারণের ফলে উৎপন্ন হয়। গ্লাইকোজেন জাতীয় শর্করা প্রাণীদেহে খাদ্য ঘাটতিতে বা অধিক পরিশ্রমের সময় শক্তি সরবরাহ করে। সেলুলোজ একটি অপাচ্য প্রকৃতির শর্করা যা আমাদের দৈনন্দিন মলত্যাগে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। এছাড়া খাদ্যে প্রোটিন কিংবা ফ্যাটের অভাব হলে শর্করা থেকে এগুলো সংশ্লেষ বা তৈরি হয়।
তাই বলা যায়, 'C' দ্বারা নির্দেশিত শর্করা জাতীয় খাদ্যের পুষ্টিগত গুরুত্ব অপরিসীম।

**ঘ** উদ্দীপকে 'A' ও 'B' ছকে প্রদর্শিত খাদ্যগুলো হলো যথাক্রমে ভিটামিন 'E' ও ভিটামিন 'C' সমৃদ্ধ খাদ্য। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভিটামিন 'E' ও ভিটামিন 'C' সমৃদ্ধ খাদ্যের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

মানুষের শরীরে ভিটামিন 'E' হলো এন্টিঅক্সিডেন্ট, যেটি ধমনিতে চর্বি জমা রোধ করে এবং সুস্থ ত্বক বজায় রাখে। এ জাতীয় ভিটামিন কোষ গঠনে সাহায্য করে এবং মানুষসহ সকল প্রাণীর বন্ধ্যাত্ব দূর করে। এছাড়া ভিটামিন 'E' এর অভাবে জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের মৃত্যুও হতে পারে।

অপরদিকে ভিটামিন 'C' ত্বক, হাড়, দাঁত ইত্যাদি কোষসমূহকে পরস্পরের সাথে জোড়া লাগিয়ে মজবুত গাঁথুনি তৈরিতে এবং শরীরের ক্ষত পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করে। দাঁত ও মাড়ি শক্ত রাখতে এবং শরীরের বাইরের অংশ ত্বকের মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে এ জাতীয় ভিটামিন সহায়তা করে। ভিটামিন 'C' রোগ প্রতিরোধে দেহের প্রহরী হিসেবে কাজ করে। এছাড়া স্নেহ, আমিষ ও অ্যামাইনো এসিডের বিপাকীয় কাজে ভিটামিন 'C' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভিটামিন 'E' ও ভিটামিন 'C' সমৃদ্ধ খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▸ ০২**

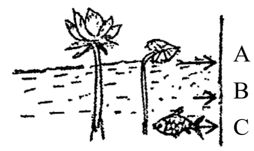


ক. ক্লোরিনেশন কাকে বলে? ১

খ. বিশুদ্ধ পানিতে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় না কেন? ২

গ. ভূপৃষ্ঠের 'B' উপাদানটি দিন দিন পানের অযোগ্য হয়ে পড়ছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'C' বেঁচে থাকতে হলে ‘A’ এর প্রয়োজন- যুক্তি দেখাও। ৪

[অধ্যায়-২ এর আলোকে]

**২নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ক্লোরিন ব্যবহারের মাধ্যমে পানিতে বিদ্যমান জীবাণু ধ্বংস করার প্রক্রিয়াকে ক্লোরিনেশন বলে।

**খ** পানিতে লবণ কিংবা এসিডের মতো তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ পানিতে এ ধরনের লবণ বা এসিড দ্রবীভূত না থাকার কারণে বিশুদ্ধ পানি বিদ্যুৎ পরিবহন করে না।

**গ** উদ্দীপকের 'B' উপাদানটি হলো পানি। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য বিশুদ্ধ পানি অপরিহার্য। তবে নানাবিধ কারণে পানির উৎসগুলো দূষিত হয়ে পানের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পানির উৎস দূষণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো-

i. গোসলের পানির উৎস, পায়খানার বর্জ্য পানিসহ অন্যান্য কাজের পানি নর্দমার নলের মধ্য দিয়ে নদ-নদীতে পড়া।

ii. বাসাবাড়ির কঠিন বর্জ্য পদার্থ বৃষ্টির পানির সাথে মিশে নদ-নদী, খাল-বিল বা লেকের পানিতে পড়া।

iii. রাসায়নিক সার, জৈব সার, কীটনাশক, বৃষ্টির পানির উৎস বা বন্যার পানির সাথে মিশে পানিতে পড়া।

iv. শিল্পকারখানা এবং ট্যানারির বর্জ্যের পানির সাথে মিশ্রিত হওয়া।

v. নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার বা জাহাজ থেকে ফেলা মলমূত্র ও তেল জাতীয় পদার্থের পানিতে পড়া।

vi. বেশির ভাগ নদীর পানিতে টেক্সটাইল মিল, ডাইং, রং তৈরির কারখানা, সার কারখানা, কাগজ তৈরির কারখানা ইত্যাদি বর্জ্য পদার্থ মিশ্রিত হওয়া।

উপরে উল্লিখিত কারণসহ আরও নানাবিধ কারণে পানির দূষণের মাধ্যমে এর মানদন্ড বজায় থাকছে না। ফলে ভূপৃষ্ঠের পানি দিনদিন পানের অযোগ্য হয়ে পড়ছে।

**ঘ** উদ্দীপকের 'C' হলো মাছ বা জলজ প্রাণী এবং A হলো জলজ উদ্ভিদ। জলজ প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য জলজ উদ্ভিদ প্রয়োজন।

জলজ প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন অক্সিজেন ও খাদ্য। জলজ উদ্ভিদগুলো সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরি করে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক রাখে। জলজ প্রাণী এ অক্সিজেন ব্যবহার করেই বেঁচে থাকে। আবার পানিতে থাকা জলজ উদ্ভিদগুলো বিশেষ করে শ্যাওলা জাতীয় জলজ উদ্ভিদগুলো জলজ প্রাণীদের খাদ্যভাডার হিসেবে কাজ করে। তাই জলজ উদ্ভিদের অভাবে জলজ প্রাণীদের খাদ্যসংকট দেখা দিবে এবং খাদ্যের অভাবে অনেক জলজ প্রাণী মারা যাবে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, জলজ প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য জলজ উদ্ভিদ প্রয়োজন।

**প্রশ্ন ▶ ০৩** রাতুলের রক্তের গ্রুপ A পজেটিভ। তার বন্ধু রাহির রক্তের গ্রুপ O নেগেটিভ। তাদের অপর বন্ধু রাজিবের ইদানীং ঘন ঘন প্রস্রাব, বেশি পিপাসা, ক্ষত দেরিতে শুকানো, ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিয়মিত ঔষধ ও শৃঙ্খলাবোধ জীবনযাপনের পরামর্শ দিলেন।

ক. হার্ট অ্যাটাক কাকে বলে? ১
খ. সন্তানসম্ভবা মহিলাদের ক্ষেত্রে Rh ফ্যাক্টর গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. রাহি কি তার বন্ধু রাতুলকে রক্তদান করতে পারবে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. রাজিবকে ডাক্তারের পরামর্শের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৩ এর আলোকে]

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হৃৎপিন্ডের করোনারি ধমনি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে হৃদপেশির রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে যে রোগের সৃষ্টি হয় তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে।

**খ** সন্তানসম্ভবা মহিলাদের জন্য বাবা এবং মা উভয়কেই একই Rh ফ্যাক্টর বিশিষ্ট হতে হবে। তা না হলে প্রথম সন্তান সুস্থ হলেও দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিবে। অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর মায়ের রক্ত থেকে অমরার মাধ্যমে সন্তানের ভ্রূণের রক্তে প্রবেশ করে লোহিত কণিকাকে ধ্বংস করে। সেক্ষেত্রে ভ্রূণ বিনষ্ট হয়ে গর্ভপাতও হতে পারে আবার যদি সন্তান জন্মও নেয় তাহলে তার প্রচণ্ড রক্তস্বল্পতা থাকে এবং জন্মের পর জন্ডিস রোগ দেখা দেয়। তাই সন্তানসম্ভবা মহিলাদের ক্ষেত্রে Rh ফ্যাক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**গ** উদ্দীপকে রাহির রক্তের গ্রুপ হলো O নেগেটিভ আর তার বন্ধু রাতুলের রক্তের গ্রুপ A পজেটিভ।

একজন মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় অ্যান্টিবডির উপস্থিতির কারণে একই ধরনের অ্যান্টিজেনযুক্ত রক্ত তার শরীরে প্রবেশ করানো হলে অ্যান্টিবডি লোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে গুচ্ছবন্ধ করে দেয়। ফলে রক্ত জমাট বেঁধে প্রাণহানি ঘটতে পারে। লোহিত রক্তকণিকায় উপস্থিত A ও B অ্যান্টিজেনের মধ্যে যে রক্তের লোহিত কণিকায় A অ্যান্টিজেন আছে সেখানে B অ্যান্টজেনের অ্যান্টিবডি থাকে। একইভাবে যে রক্তের লোহিত কণিকায় B আন্টিজেন আছে সেক্ষেত্রে A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টবডি থাকে। O গ্রুপধারী রাহির রক্তে A বা B কোনো অ্যান্টিজেন নেই। তাই অন্য গ্রুপের অ্যান্টিজেনের সাথে এর কোনো বিক্রিয়া করে না। তাছাড়া অল্প কিছু অ্যান্টিবডি গ্রহীতার শরীরের সকল রক্তের সাথে সহজেই মিশে যাবে।

তাই রাহি রাতুলকে রক্ত দিতে পারবে এবং তাতে কোনো সমস্যা হবে না।

**ঘ** রাজিব ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। ডাক্তার সাহেব রাফিনের আব্বাকে সুস্থ থাকার জন্য ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখার উপদেশ দেন। পথ্য নিয়ন্ত্রণ, জীবন শৃঙ্খলা এবং ওষুধ সেবন এ তিনটি উপায়ে রোগটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো-

১. **পথ্য নিয়ন্ত্রণ :**
   i. রাজিবকে এমন খাবার খেতে হবে, যা প্রোটিনসমৃদ্ধ (গাঢ় সবুজ রঙের শাকসবজি, বরবটি, মাশরুম, বাদাম, ডিম, মাছ, চর্বি ছাড়া মাংস ইত্যাদি) এবং যাতে শ্বেতসার কম থাকে।
   ii. চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে।

২. **জীবন শৃঙ্খলা :**
   i. নিয়মিত ও পরিমাণমতো সুষম খাবার খেতে হবে।
   ii. নিয়মিত ও পরিমাণমতো ব্যায়াম করতে হবে।
   iii. নিয়মিত রক্তে ও প্রস্রাবে শর্করা পরিমাণ পরিমাপ করে এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৩. **ঔষধ সেবন :** খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা মেনে চলে ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। যদি তার ইনসুলিন নেওয়ার প্রয়োজন হয় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ইনসুলিন গ্রহণ করতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, বহুমূত্র রোগ সম্পূর্ণভাবে নিরাময়যোগ্য রোগ নয় বলেই ডাক্তার সাহেব রাজিবকে শৃঙ্খলা পালন ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নিয়মিত ঔষধ সেবনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

**প্রশ্ন ▶ ০৪** একটি ফুটবল টিমে ১০-১৯ বছরের খেলোয়াড়রা খেলা করে।

ক. বয়ঃসন্ধিকাল কাকে বলে? ১
খ. জিনকে জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের খেলোয়াড়দের মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের খেলোয়াড়দের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৪ এর আলোকে]

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সাধারণত ছেলেমেয়েদের ১১-১৯ বছরের সময়কালকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে।

**খ** জিন হলো বংশগতির একক। জীবের এক একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একাধিক জিন কাজ করে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি মাত্র জিন বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। এককোষী ব্যাকটেরিয়া, আমাশয়ের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু অ্যামিবা থেকে শুরু করে বিশাল আকৃতির বটবৃক্ষ, বিশাল আকৃতির হাতি, তিমি ইত্যাদি বুদ্ধিমান জীব মানুষ পর্যন্ত সবারই আকৃতি প্রকৃতি তার জিনের সংকেত দ্বারা নির্ধারিত হয়। একারণেই জিনকে জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের খেলোয়াড়রা বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করছে। এসময় তাদের মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

বয়ঃসন্ধিকালে খেলোয়াড়দের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন দেখা যায়। এ সময়ে তাদের নিকটজনের মনোযোগ, যত্ন ও ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয় এবং আবেগ দ্বারা চালিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। ছেলে খেলোয়াড়দের ও মেয়েদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। ফলে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। মানসিক পরিপক্বতা শুরু হওয়া এ সময়ে খেলোয়াড়রা পরনির্ভরতার মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করে।

তারা প্রত্যেক বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠা করতে সচেস্ট হয় এবং প্রাপ্তবয়স্কের মতো আচরণ করে। এ সময়ে তারা নিজেদেরকে বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে আলাদা ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এছাড়া তারা নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে যে কোনো বিষয়ে জেদ করে। ফলে দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

**ঘ** উদ্দীপকের খেলোয়াড়দের বয়ঃসন্ধিকাল চলছে। এ সময়ে খেলোয়াড়দের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

বয়ঃসন্ধিকালের বাড়ন্ত বয়সে দৈহিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য খেলোয়াড়দের এ সময় পুষ্টিকর খাবার বিশেষ করে বেশি করে শাকসবজি খাওয়া ও পানি পান করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা উচিত। বয়ঃসন্ধিকালে স্বাভাবিক শারীরিক পরিবর্তন ছাড়াও নানা রকম শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। এ বিষয়ে মা-বাবা ও নিকটাত্মীয়দের সাথে আলাপ-আলোচনা বা পরামর্শ করা দরকার। সমস্যা জটিল হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। অনেক সময় প্রজনন অঙ্গের আশেপাশে চুলকানি বা কুচকিতে (উরুর ফাঁকে) ঘা হতে পারে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। কিছু দিনের মধ্যে ভালো না হলে এসব বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য খেলোয়াড়দেরকে বয়ঃসন্ধিকালের বিভিন্ন পরিবর্তন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে মেনে নিয়ে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা উচিত। এ বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে অস্বস্তি বা ভয় কমে যাবে। এসব বিষয় নিয়ে খোলা মনে মা-বাবা বা বড় ভাই-বোনের সাথে আলোচনা করলে সংকোচ কেটে যাবে। ফলে একা থাকা বা লোকজন এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমে যাবে। এছাড়া ভালো গল্পের বই পড়া, সাথীদের সাথে খেলাধুলা করলে মানসিক প্রফুল্লতা বজায় থাকবে।

বয়ঃসন্ধিকালে খেলোয়াড়দের দৈহিক ও মানসিক স্থাস্থ্যরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তারা সুস্থ সবল মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সক্ষম হবে।

**প্রশ্ন ▸ ০৫** সেঁজুতি দূর থেকে ব্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষকের লেখা স্পষ্ট দেখতে পায় না। অন্যদিকে সেঁজুতির বাবার কাছের জিনিস দেখতে সমস্যা হয়। পরবর্তীতে সেঁজুতি ও তার বাবা ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার সেঁজুতির জন্য এক ধরনের লেন্স এবং তার বাবার জন্য ভিন্ন ধরনের লেন্স ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন।

ক. লেন্সের ক্ষমতা কাকে বলে? ১
খ. স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব বলতে কী বুঝায়? ২
গ. সেঁজুতি চোখের কোন ধরনের ত্রুটিতে আক্রান্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সেঁজুতির বাবার জন্য ডাক্তারের ভিন্ন ধরনের লেন্স ব্যবহারের পরামর্শের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৫ এর আলোকে]

## ৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মিকে কোনো লেন্সের অভিসারী গুচ্ছে (উত্তল লেন্সে) বা অপসারী গুচ্ছে (অবতল লেন্সে) পরিণত করার প্রবণতাকে লেন্সের ক্ষমতা বলে।

**খ** চোখের সবচেয়ে কাছে যে বিন্দু পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুকে খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায় তাকে স্পষ্ট দৃষ্টির নিকট বিন্দু বলে এবং চোখ হতে ঐ বিন্দুর দূরত্বকে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব বলে। এ দূরত্ব মানুষের বয়সের সাথে পরিবর্তিত হয়। যেমন- একজন শিশুর স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব ৫ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি এবং একজন স্বাভাবিক বয়স্ক লোকের এ দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার।

**গ** সেঁজুতি হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি ত্রুটিতে আক্রান্ত। চোখের এ ত্রুটি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি ত্রুটিসম্পন্ন ব্যক্তির চোখের দূরবিন্দুটি অসীম দূরত্ব অপেক্ষা কিছুটা নিকটে থাকে এবং বস্তুকে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব হতে আরও কাছে আনলে অধিকতর স্পষ্ট দেখায়। সাধারণত এ ত্রুটি চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে বা চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কমে গেলে এবং কোনো কারণে অক্ষিগোলকের ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেলে দেখা দেয়।

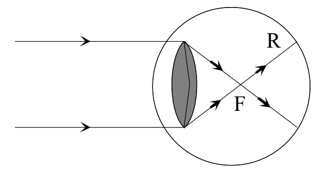

চিত্র : হ্রস্বদৃষ্টি

এ ত্রুটির ফলে দূরের বস্তু হতে নির্গত আলোকরশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনা R এর সামনে F বিন্দুতে প্রতিবিম্ব গঠন করে। রেটিনায় প্রতিবিম্ব গঠিত না হওয়ায় লক্ষ্যবস্তুকে অস্পষ্ট দেখায়।

**ঘ** সেঁজুতি হ্রাস্বদৃষ্টি ও তার বাবা দীর্ঘদৃষ্টি ত্রুটিতে আক্রান্ত। তাদের চোখের ত্রুটি একই ধরনের না হওয়ায় ডাক্তার সেঁজুতির বাবাকে ভিন্ন ধরনের লেন্স ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। তার এ পরামর্শের যৌক্তিকতা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি ত্রুটি দূর করার জন্য চোখের সামনে একটি উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হয়। ফলে চোখের নিকটতম বিন্দু (N) হতে নির্গত আলোকরশ্মি এ সাহায্যকারী লেন্সে এবং চোখের লেন্সে পর পর দুইবার প্রতিসরিত হওয়ার কারণে ফোকাস দূরত্ব কমে যাবে এবং প্রয়োজনমতো অভিসারী হয়ে প্রতিবিম্বটি রেটিনা R এর উপরে পড়বে। ফলে বস্তুটিকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে।

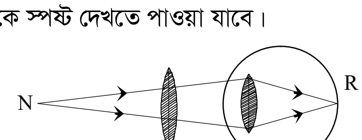

চিত্র : দীর্ঘদৃষ্টির প্রতিকার

এক্ষেত্রে উত্তল লেন্স ব্যবহারের ফলে লক্ষ্যবস্তু থেকে আগত রশ্মি সেঁজুতির বাবার চোখের রেটিনায় বস্তুর বিম্ব সৃষ্টি করে যা পরে মস্তিষ্কের মাধ্যমে তার দর্শনের অনুভূতি জাগায়। ফলে তিনি বস্তুটিকে স্পষ্ট দেখতে পান। সুতরাং সেঁজুতির বাবার জন্য ভিন্ন লেন্সের ব্যবহারের পরামর্শটি ছিল যৌক্তিক।

**প্রশ্ন ▶ ০৬** রহিম সাহেবের কারখানায় যে পদার্থটি উৎপন্ন হয় সেটি সাধারণত সাদা বা হালকা বাদামি রঙের হয়। টানলে লম্বা হয়। তার ভাই রহমানের কারখানায় যে পদার্থটি উৎপন্ন হয়, সেটি দাহ্য ও পুড়লে প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন হয়।

ক. পলিমার কাকে বলে? ১

খ. কেরাটিন দিয়ে তৈরি পোশাক কোন ঋতুর জন্য উপযোগী, ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রহিম সাহেবের কারখানার উৎপন্ন পদার্থটির ভৌত ধর্ম সম্পর্কে লিখ। ৩

ঘ. রহিম ও রহমানের কারখানার উৎপন্ন দ্রব্য দুটির মধ্যে কোনটি পরিবেশের জন্য বেশি ক্ষতিকর বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

[অধ্যায়-৬ এর আলোকে]

**৬নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অনেকগুলো একই রকম ছোট ছোট অংশ জোড়া দিয়ে যে একটি বড় জিনিস পাওয়া যায় তাকে পলিমার বলে।

**খ** কেরাটিন দিয়ে পশম তন্তু গঠিত। পশম তন্তু দিয়ে পশম বা উলের পোশাক তৈরি করা হয়। এ তন্তুর মাঝে ফাঁকা জায়গা থাকে যেখানে বাতাস আটকে থাকতে পারে। বাতাস তাপ অপরিবাহী হওয়ায় পশম বা উলের কাপড় তাপ কুপরিবাহী। পশমি কাপড় পরে থাকলে শীতের দিনে শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে এ ধরনের কাপড় পরিধানে আমরা গরম অনুভব করি। এজন্য পশমি পোশাক শীত ঋতুর জন্য খুবই উপযোগী।

**গ** উদ্দীপকে রহিম সাহেবের কারখানার উৎপন্ন পদার্থটি হলো রাবার। নিচে রাবারের ভৌত ধর্ম সম্পর্কে লিখা হলো-

প্রাকৃতিক রাবার পানিতে অদ্রবণীয় একটি অদানাদার কঠিন পদার্থ। রাবার কিছু কিছু জৈব দ্রাবক যেমন- অ্যাসিটোন, মিথানল এগুলোতে অদ্রবণীয় হলেও টারপেন্টাইন, পেট্রোল, ইথার, বেনজিন এগুলোতে সহজেই দ্রবণীয়। রাবার সাধারণত সাদা বা হালকা বাদামি রঙের হয়। এটি একটি স্থিতিস্থাপক পদার্থ অর্থাৎ একে টানলে লম্বা হয় এবং ছেড়ে দিলে আগের অবস্থায় ফিরে যায়। বেশিরভাগ রাবারই তাপ সংবেদনশীল অর্থাৎ তাপ দিলে গলে যায়। বিশুদ্ধ রাবার বিদ্যুৎ ও তাপ কুপরিবাহী।

**ঘ** উদ্দীপকের রহিম ও রহমানের কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য দুটি হলো যথাক্রমে রাবার ও প্লাস্টিক। এদের মধ্যে প্লাস্টিক পরিবেশের জন্য বেশি ক্ষতিকর বলে আমি মনে করি। নিচে এর সপক্ষে যুক্তিসহ মতামত প্রদান করা হলো :

রাবার একটি পচনশীল দ্রব্য। এটি দীর্ঘদিন রেখে দিলে ধীরে ধীরে তা নষ্ট হয়ে যায়। কারণ রাবার বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। এছাড়াও আরও কিছু রাসায়নিক পদার্থ, বিশেষ করে ওজোন ($O_3$) প্রাকৃতিক রাবারে সাথে বিক্রিয়া করে, যার কারণে রাবার ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে প্লাস্টিক রাসায়নিকভাবে যথেষ্ট নিষ্ক্রিয় এবং এটি পচনশীল নয়। এর ফলে পুনর্ব্যবহার না করে বর্জ্য হিসেবে ফেলে দিলে এগুলো পরিবেশে জমা হতে থাকে এবং নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শহরে শিল্পকারখানা বেশি স্থাপনের কারণে সেখানে নর্দমার নালায় প্রচুর প্লাস্টিক পড়ে থাকে। এগুলো জমতে জমতে একপর্যায়ে নালা নর্দমা বন্ধ হয়ে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেখা যায়, সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই রাস্তায় পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। প্লাস্টিক এসব বর্জ্য অপরিকল্পিত উপায়ে ব্যবস্থাপনার কারণে এর বড় একটি অংশ নদনদী, হ্রদ বা জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। এভাবে বর্জ্য জমতে থাকলে এক সময় নদীর গভীরতা কমে যায়, যা নাব্যতার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া প্লাস্টিক বর্জ্য দীর্ঘ সময় মাটিতে থাকলে তা মাটির উর্বরতা নষ্ট করে দেয়।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, রাবার ও প্লাস্টিকের মধ্যে প্লাস্টিকই পরিবেশের জন্য বেশি ক্ষতিকর।

**প্রশ্ন ▶ ০৭** সোহান তার খাদ্য তালিকায় পোলাও, মাংস, বার্গার ও দুধ-চা রাখতে পছন্দ করে। আবার শুভ তার খাদ্য তালিকায় শাকসবজি, ছোট মাছ, ডাল ও আদা-চা রাখতে পছন্দ করে। অপরদিকে সৌমিকের পাকস্থলীর pH এর মান ১.৫।

ক. দুর্বল এসিড কাকে বলে? ১

খ. ভোলতা কামড় দিলে ফুলে যায় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সৌমিকের পাকস্থলীর pH স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সোহান ও শুভ এর খাদ্য তালিকার মধ্যে কোনটি স্বাস্থ্যসম্মত? তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৭ এর আলোকে]

**৭নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** যেসব এসিডসমূহ পানিতে পুরোপুরি বিয়োজিত না হয়ে আংশিকভাবে বিয়োজিত হয় অর্থাৎ যতগুলো এসিডের অণু থাকে তার সবগুলো হাইড্রোজেন আয়ন $H^+$ তৈরি করে না তাদেরকে দুর্বল এসিড বলে।

**খ** ভোলতা হুল ফুটালে বা কামড় দিলে আক্রান্ত স্থান ফুলে যায়। কারণ ভোলতার হুলে হিস্টামিন নামে এক ধরনের ক্ষারক পদার্থ থাকে। ফলে জ্বালা করে। আর হিস্টামিনের প্রভাব আশেপাশের কোষের উপরও পড়ে। ফলে কোষগুলো প্রসারিত হয়। তাই ভোলতা কামড় দিলে আক্রান্ত স্থান ফুলে যায়।

**গ** উদ্দীপকে সৌমিকের পাকস্থলীর pH ১.৫ যা তার স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। pH এর মান ১.৫ এর অর্থ হচ্ছে এসিডিক অবস্থা। পাকস্থলীতে খাদ্য হজম হওয়ার জন্য এসিডিক অবস্থা জরুরি। আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্য হজম করার জন্য দরকারী pH হচ্ছে ২। এটি হচ্ছে যথেষ্ট শক্তিশালী এসিডের পরিমাণ। এ মান ০.৫ এর মতো তারতম্য হলেই তা বদহজম সৃষ্টি করে। আর তীব্র এসিডিটির কারণেই আমাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা সৃষ্টি হয়। এমনকি গ্যাস্ট্রিক থেকে আলসার হতে পারে। কাজেই দেখা যায় সৌমিকের পাকস্থলীর pH ১.৫ যা ২ থেকে ০.৫ কম যা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থাৎ সৌমিকের বদহজম থেকে শুরু করে গ্যাস্ট্রিক আলসার পর্যন্ত হতে পারে।

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের সৌমিকের পাকস্থলীর pH স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

**ঘ** উদ্দীপকে সোহান তার খাদ্য তালিকায় পোলাও, মাংস, বার্গার ও দুধ চা রাখতে পছন্দ করে। অপরদিকে শুভ তার খাদ্য তালিকায় শাকসবজি, ছোট মাছ, ডাল ও আদা চা রাখতে পছন্দ করে। এদের দুইজনের খাদ্য তালিকার মধ্যে শুভ এর খাদ্য তালিকা স্বাস্থ্যসম্মত। নিচে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা বর্ণনা করা হলো-

পোলাও, মাংস হচ্ছে গুরুপাক খাবার। এগুলো তৈরি করতে প্রচুর তেল ও মসলা ব্যবহৃত হয় যা অস্বাস্থ্যকর। আর বার্গার হচ্ছে ফাস্ট ফুড। এসব খাবার মুখরোচক, সুস্বাদু হলেও স্বাস্থ্যকর নয়। কারণ এসব

খাবারে প্রচুর পরিমাণে চর্বি ও চিনি থাকে যা সোহানের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অপরদিকে শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, মিনারেল, খনিজ লবণ ও পানি থাকে যা শরীরের জন্য অতি প্রয়োজন। ছোট মাছ ও ডাল আমিষ জাতীয় খাবার যা দেহ গঠনে সহায়তা করে। আর আদা চা শরীরকে চাঙা রাখতে সাহায্য করে। এসব খাবার স্বাস্থ্যকর এবং শরীরের জন্য উপকারী।

অতএব উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে বলা যায়, সোহান ও শুভ এর খাদ্য তালিকার মধ্যে শুভ এর খাদ্য তালিকা স্বাস্থ্যসম্মত।

**প্রশ্ন ▶ ০৮** নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :

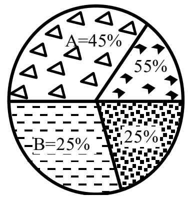


ক. জিপসাম এর সংকেত লেখ। ১

খ. হিউমাস বলতে কী বুঝায়? ২

গ. চিত্রে 'A' উপাদানটির ব্যবহার বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের জন্য চিত্রের B উপাদানটির উৎস হুমকিস্বরূপ– বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৮ এর আলোকে]

**৮নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** জিপসাম এর সংকেত হলো $CaSO_4.2H_2O$.

**খ** মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ হিউমাস নামে পরিচিত। এটি অ্যামিনো এসিড, প্রোটিন, চিনি, অ্যালকোহল, চর্বি, তেল, লিগনিন, ট্যানিন ও অন্যান্য অ্যারোমেটিক যৌগের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ জটিল পদার্থ। এটি দেখতে অনেকটা কালচে রঙের হয়। মৃত গাছপালা ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে হিউমাস তৈরি হয়।

**গ** উদ্দীপকের চিত্রে প্রদর্শিত A উপাদানটি হলো মাটিতে বিদ্যমান খনিজ পদার্থ। নিচে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের ব্যবহার বর্ণনা করা হলো-

i. ম্যাগনেটাইট ($Fe_3O_4$) - লোহা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

ii. চুনাপাথর ($CaCO_3$) - ঘরবাড়ি, সিমেন্ট, সোডা, গ্লাস, লোহা, স্টিল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মাটির অম্লত্ব প্রশমনে এটি ব্যবহার করা হয়।

iii. কোয়ার্টজ ($SiO_2$) - কাচ, সিরিশ কাগজ, রেডিও, ঘড়ি ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

iv. রুপা (Ag) - গহনা ও ধাতব মুদ্রা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

v. মাইকা (Mica) - বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ নিরোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

vi. জিপসাম ($CaSO_4.2H_2O$) - সিমেন্ট ও প্লাস্টার অব প্যারিস তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

vii. সোনা ও হীরা- গহনা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

viii. ধাতব পাইরাইটস- সালফার ও নানা রকম ধাতু তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ix. গ্যাস, কয়লা, পেট্রোল- জ্বালানি হিসেবে, রান্নার কাজে, গাড়ি ও শিল্পকারখানায় ব্যবহার করা হয়।

**ঘ** উদ্দীপকের চিত্রে B উপাদানটি হলো পানি। বাংলাদেশে মনুষ্য সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে পানির উৎস হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো-

নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রতিটি নদনদী খরস্রোত হওয়ায় নদী ভাঙন সৃষ্টি হয়। নদী ভাঙনের ফলে মাটি পানির স্রোতের সাথে মিশে যায় এবং এক পর্যায়ে নদীর তলায় জমা হয় ও ধীরে ধীরে নদী ভরাট হয়ে যায়। এতে একদিকে যেমন নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়, অন্যদিকে তেমনি নদী শুকিয়ে যায়। এসব নদনদী দখল করে মানুষ নানা রকম স্থাপনা গড়ে তোলার ফলে নদীর গতিপথ সরু হয়ে যায় এবং পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। ফলস্বরূপ একটু ভারী বর্ষণের ফলে বন্যা সৃষ্টি হয়। নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দেওয়ার ফলে এদের শাখা-প্রশাখায় পানির প্রবাহ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। আবার শহরের আশপাশে অবস্থিত শিল্পকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য নদীতে ফেলা হয়। এসব কারখানা থেকে নির্গত আর্সেনিক, মারকারি, সিসা ইত্যাদি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ পানিতে মিশে ভূগর্ভস্থ পানিকে দূষিত করে তোলে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ নদীর উৎপত্তিস্থল পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে কয়েকটি নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলের অনেক নদী পানিশূন্য হয়ে পড়েছে। পানির গতিপথ পরিবর্তন আমাদের পানি সম্পদের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। ভারতের ব্রহ্মপুত্র নদের পানির গতিপথ পরিবর্তন করে শিলিগুড়ি করিডর দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এটি বাস্তবায়িত হলে আমাদের দেশের প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার হাওর এলাকাসহ দক্ষিণাঞ্চলে বিপর্যয় নেমে আসবে। এছাড়া ভারতের টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণে পূর্বাঞ্চল পানিশূন্য হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, প্রাকৃতিক ও মনুষ্য বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের জন্য পানির উৎস হুমকিস্বরূপ।

**প্রশ্ন ▶ ০৯** মীম বাসে ঢাকা থেকে সিলেট যাচ্ছিল। বাসটির ভর ছিল ৬০০ কেজি এবং এটি ১০ মি./সে.$^২$ ত্বরণে চলছিল। চলন্ত বাসটিকে হঠাৎ ড্রাইভার ব্রেক চাপলে মীমসহ যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। আবার বাসটি যখন চলতে শুরু করল তখন তারা পিছনের দিকে হেলে পড়ল।

ক. নিউটনের গতিবিষয়ক ৩য় সূত্রটি কী? ১

খ. আম গাছ থেকে মাটিতে পড়ে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বাসটির উপর ক্রিয়াশীল বলের মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের যাত্রীরা প্রথমে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেও পরবর্তীতে পিছনে হেলে পড়ার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-১০ এর আলোকে]

**৯নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** নিউটনের গতিবিষয়ক তৃতীয় সূত্রটি হলো- প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

**খ** মহাকর্ষ সূত্রানুসারে দুটি বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণ বল বস্তুদ্বয়ের ভরের উপর নির্ভর করে। যে বস্তুর ভর বেশি তার আকর্ষণ বল বেশি আর যে বস্তুর ভর কম তার আকর্ষণ বল কম হয়। পৃথিবী এবং আমের মধ্যে পৃথিবীর ভর আমের ভরের চেয়ে অনেক বেশি হয়। ফলে আমের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলও অনেক বেশি হয়। এজন্য আম গাছ থেকে মাটিতে পড়ে।

**গ** উদ্দীপকের তথ্যানুসারে,
বাসের ভর, m = ৬০০ কেজি
বাসের ত্বরণ, a = ১০ মি./সে.$^2$
বাসটির উপর ক্রিয়াশীল বল, F = ?
আমরা জানি, F = ma
= ৬০০ × ১০
= ৬০০০ নিউটন
অতএব, বাসটির উপর ক্রিয়াশীল বলের মান ৬০০০ নিউটন।

**ঘ** উদ্দীপকের যাত্রীরা গতি জড়তার কারণে প্রথমে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেও পরবর্তীতে স্থিতি জড়তার কারণে পিছনের দিকে হেলে পড়ে। নিচে এ ঘটনা দুটির কারণ বিশ্লেষণ করা হলো-
গতিশীল বস্তুর চিরকাল সমবেগে গতিশীল থাকতে চাওয়ার প্রবণতা বা ধর্ম হলো গতি জড়তা। উদ্দীপকের চলন্ত বাসটি গতিশীল থাকায় আরোহীদের সমস্ত দেহই গতিশীল ছিল। অর্থাৎ চলন্ত অবস্থায় বাসের সাথে যাত্রীরাও একই গতি প্রাপ্ত হয়। বাসটির ড্রাইভার ব্রেক চাপার ফলে গাড়ি থামার সাথে সাথে যাত্রীদের দেহের নিম্নাংশ স্থির অবস্থায় থাকে। কিন্তু দেহের উপরের অংশ গতি জড়তার প্রভাবে গতি বজায় রাখতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। এজন্য বাসটি হঠাৎ ব্রেক চাপায় যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।
আবার স্থিতিশীল বস্তুর চিরকাল স্থির থাকতে চাওয়ার প্রবণতা বা স্থিতি বজায় রাখার ধর্ম হলো স্থিতি জড়তা। গাড়িটি যখন স্থিতিশীল ছিল তখন আরোহীদের সমস্ত দেহই স্থিতিশীল ছিল। বাসটি আবার চলতে শুরু করার সাথে সাথে যাত্রীদের দেহের নিম্নাংশ গতিশীল হয় কিন্তু শরীরের উপরের অংশ স্থিতি জড়তার কারণে স্থির থাকতে চায়। ফলে শরীরের নিচের অংশ থেকে উপরের অংশ পিছিয়ে পড়ে। এজন্য যাত্রীরা পরবর্তীতে পিছনের দিকে হেলে পড়ল।

**প্রশ্ন ▶ ১০**

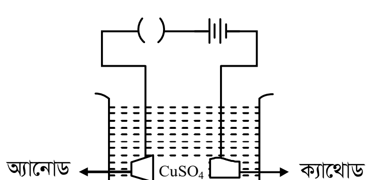


ক. তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কী? ১
খ. লোডশেডিং বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রাত্যহিক জীবনে প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব কতটুকু? তোমার মতামত দাও। ৪

[অধ্যায়-১২ এর আলোকে]

**১০নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** তড়িৎ প্রবাহের দ্বারা দ্রবণের দুই ভাগে বিভক্ত বা বিশ্লেষণে হতে সক্ষম দ্রব্য হলো তড়িৎ দ্রব বা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ।

**খ** চাহিদার তুলনায় তড়িতের উৎপাদন কম হলে সব জায়গায় একই সাথে তড়িৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। তখন নির্দিষ্ট কিছু এলাকার তড়িৎ সরবরাহ বন্ধ করে উৎপাদিত তড়িৎ অন্যান্য এলাকায় চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়। তড়িৎ এর সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করার এ কৌশলই হলো লোডশেডিং। তড়িতের উৎপাদন যদি বেশ কম হয় তবে সব এলাকাতেই পর্যায়ক্রমে তড়িতের সরবরাহ বন্ধ অর্থাৎ লোডশেডিং করতে হয়।

**গ** উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি হলো $CuSO_4$ দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ। নিচে $CuSO_4$ দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করা হলো-
তড়িৎ বিশ্লেষণের জন্য একটি কাচপাত্রে কিছু তুঁতে অর্থাৎ $CuSO_4$ ও পানি নিই। $CuSO_4$ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে $Cu^{2+}$ ও $SO_4^{2-}$ আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়। এখন দ্রবণের মধ্যে দুটি তামার পাত ডুবিয়ে যদি পাত দুটির সাথে একটি তড়িৎকোষ সংযুক্ত করা হয় তাহলে $Cu^{2+}$ আয়নগুলো ক্যাথোডে যায়। ক্যাথোড থেকে দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিস্তড়িত তামার অণুতে পরিণত হয়ে ক্যাথোডে জমা হয়। অপরদিকে $SO_4^{2-}$ আয়নগুলো অ্যানোড দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সেখানে যায় এবং সেখানে গিয়ে দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিস্তড়িত হয়। নিস্তড়িত $SO_4$ অ্যানোড থেকে Cu গ্রহণ করে $CuSO_4$ উৎপন্ন করে। এ $CuSO_4$ আবার দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে দ্রবণের ঘনত্ব অপরিবর্তিত রাখে। সুতরাং দেখা যায় যে, দ্রবণ থেকে যে পরিমাণ Cu ক্যাথোডে জমা হয় ঠিক সেই পরিমাণ Cu অ্যানোড থেকে দ্রবণে চলে আসে। অর্থাৎ অ্যানোড থেকে তামা ক্যাথোডে জমা হয়, ফলে অ্যানোডের ভর যতটুকু হ্রাস পায় ক্যাথোডের ভর ততটুকুই বৃদ্ধি পায়।

**ঘ** উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি হলো তড়িৎ বিশ্লেষণ। প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ বিশ্লেষণের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো-
তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধাতুর উপর সুবিধামতো অন্য কোনো ধাতুর প্রলেপ দিতে হয়। সাধারণত কোনো নিকৃষ্ট ধাতু যেমন- তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি জিনিসকে জলবায়ু থেকে রক্ষা করার এবং সুন্দর দেখানোর জন্য এদের উপর সোনা, রুপা, নিকেল ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর প্রলেপ দিতে হয়। তড়িৎ প্রলেপনের একটি বিশেষ পদ্ধতি হলো ইলেকেট্রোটাইপিং বা তড়িৎ মুদ্রণ। তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রণালিতে হরফ, ব্লক, মডেল ইত্যাদি তৈরি করা হয়। তড়িৎ মুদ্রণের জন্য প্রথমে লেখাটি সাধারণ টাইপে কম্পোজ করে মোমের ওপর ছাপ নেওয়া হয়। এর উপর কিছু গ্রাফাইট গুঁড়া ছড়িয়ে একে তড়িৎ পরিবাহী করা হয়।

খনি থেকে সাধারণত কোনো ধাতু বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। এ প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানা ধাতুর মিশ্রণ থেকে সহজে ধাতু নিষ্কাশন এবং তা শোধন করা যায়। কোনো ডিসি মেইন লাইনের দুটি তারের কোনটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তা তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। এ প্রক্রিয়াটির কৌশল অবলম্বন করে কোনো কোনো যন্ত্রাংশ মেরামত করা যায়।
অতএব উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটির আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানা কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ১১** রানা চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে। পেয়ারা গাছ থেকে মাটিতে পড়ে হাতে ব্যথা পেল। ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে এক্স-রে করে ডাক্তার নিশ্চিত হলেন যে, তার হাড় ভেঙে গেছে।

ক. আলট্রাসনোগ্রাফি কী? ১

খ. ক্যানসার নিরাময়ে রেডিওথেরাপির ভূমিকা কী? ২

গ. ডাক্তারের গৃহীত ব্যবস্থাটির কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. গৃহীত ব্যবস্থায় ঝুঁকি ও ঝুঁকি এড়ানোর কৌশল বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-১৪ এর আলোকে]

**১১নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** আলট্রাসনোগ্রাফি হলো শরীরের অভ্যন্তরে নরম পেশিসমূহের ক্ষতি নিরূপণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত আলট্রাসাউন্ড/উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গ।

**খ** রেডিওথেরাপি হলো ক্যান্সারের আরোগ্য বা নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল। রেডিওথেরাপিতে সাধারণত উচ্চক্ষমতার এক্স-রে ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করা হয়। এই এক্স-রে করে শরীরের যে অঙ্গে ক্যান্সার হয়েছে সে অঙ্গের আক্রান্ত কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। কোষের ভেতরকার ডিএনএ (DNA) ধ্বংস করে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। ফলে ক্যান্সার নিরাময় হয়ে যায়।

**গ** উদ্দীপকে ডাক্তারের গৃহীত ব্যবস্থা হলো এক্স-রে পরীক্ষা। সাধারণত হাড়ের কোনো সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য পরীক্ষাটি ব্যবহার করা হয়। এক্স-রে এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলো-

এক্স-রে মেশিনে একটি কাচের গোলকের দুই পাশে ক্যাথোড ও অ্যানোড দুটি ইলেকট্রোড থাকে। ক্যাথোড টাংস্টেনের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে উত্তপ্ত করা হয়। তাপের কারণে ফিলামেন্ট থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয় এবং অ্যানোডের ধনাত্মক ভোল্টেজের কারণে সেটি তার দিকে ছুটে যায়। ক্যাথোড এবং অ্যানোডের ভেতর ভোল্টেজ যত বেশি হবে, ইলেকট্রন তত বেশি গতিশক্তিতে অ্যানোডের দিকে ছুটে যাবে। এক্স-রে টিউবে এ ভোল্টেজ ১০০ হাজার ভোল্টেজের কাছাকাছি হতে পারে। ক্যাথোড থেকে প্রচণ্ড শক্তিতে ছুটে আসা ইলেকট্রন অ্যানোডকে আঘাত করে। এ শক্তিশালী ইলেকট্রনের আঘাতে অ্যানোডের পরমাণুর ভেতর দিকের কক্ষপথের ইলেকট্রন কক্ষপথচ্যুত হয়। তখন বাইরের দিকের কক্ষপথের কোনো একটি ইলেকট্রন সেই জায়গাটা পূরণ করে। এ সময় যে শক্তিটুকু অবশিষ্ট থেকে যায়, সেটি শক্তিশালী এক্স-রে হিসেবে বের হয়ে আসে। এটি শরীরের মাংসপেশি ভেদ করে গিয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি তুলতে পারে। তাই হাড়ের ক্ষয় হলে বা ভেঙে গেলে ডাক্তার এক্স-রে এর মাধ্যমে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে, রানার হাতের হাড় ভেঙেছে।

**ঘ** ডাক্তারের গৃহীত ব্যবস্থাটি হলো এক্স-রে। এক্স-রে ব্যবহারে একদিকে যেমন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে অন্যদিকে তেমনি ঝুঁকি রয়েছে। এক্স-রে ব্যবহারের ঝুঁকিগুলো হলো-

i. অতিরিক্ত এক্স-রে জীবকোষ ধ্বংস করে।

ii. শিশুদের প্রজননতন্ত্রে এক্স-রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

iii. গর্ভবতী অবস্থায় (বিশেষত ২-৪ মাস সময়ের মাঝে) এক্স-রে মা ও শিশু উভয়ের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

iv. একই জায়গায় বারবার এক্স-রে করার ফলে টিউমার সৃষ্টির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

এক্স-রে এর ঝুঁকি এড়ানোর কৌশলসমূহ নিম্নরূপ-

i. গর্ভবতী মহিলাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এক্স-রে রুমে যাওয়া ঠিক নয়।

ii. অতি প্রয়োজন ছাড়া গর্ভবতী মহিলার পেট বা তলপেটের অংশটুকু এক্স-রে করা হয় না।

iii. রোগীর এক্স-রে পরীক্ষা করার সময় এক্স-রে করা অংশটুকু ছাড়া বাকি শরীর সিসা দিয়ে তৈরি অ্যাপ্রোন দিয়ে ঢেকে নিতে হয়।

## মডেল টেস্ট- ০৪

# বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| উত্তর | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | K | ২ | M | ৩ | L | ৪ | M | ৫ | N | ৬ | N | ৭ | M | ৮ | L | ৯ | L | ১০ | L | ১১ | M | ১২ | N | ১৩ | N | ১৪ | K | ১৫ | K |
| | ১৬ | N | ১৭ | M | ১৮ | L | ১৯ | M | ২০ | N | ২১ | N | ২২ | N | ২৩ | K | ২৪ | N | ২৫ | N | ২৬ | L | ২৭ | K | ২৮ | M | ২৯ | N | ৩০ | M |

# সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▶ ০১** মনছুরা খানম খাদ্য পচন রোধে পরিমিত পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেন এবং বিশেষ কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এতে তার গৃহে বানানো খাদ্যদ্রব্য অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। অন্যদিকে তার প্রতিবেশী ফল ব্যবসায়ী মুরাদ মিয়াও ফলের পচন রোধে এবং দীর্ঘদিন ভালো রাখার জন্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেন।

ক. চর্বি কী? ১

খ. রাফেজ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মনছুরা খানমের ব্যবহৃত সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মনছুরা খানম ও মুরাদ মিয়ার সংরক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে কোনটি জনস্বাস্থ্যকর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[অধ্যায়-১ এর আলোকে]

**১নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** চর্বি হচ্ছে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড যা সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থায় থাকে।

**খ** রাফেজ মূলত সেলুলোজ নির্মিত উদ্ভিদ কোষপ্রাচীর যা প্রধানত উদ্ভিদ থেকেই পাওয়া যায়। শস্যবীজ, ডাল, আলু, খোসাসমেত টাটকা ফল এবং শাকসবজি রাফেজের প্রধান উৎস। রাফেজ আমাদের দেহে কোনো পুষ্টি না যোগালেও কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এটি সরাসরি খাদ্যনালির মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়।

**গ** মনছুরা খানমের ব্যবহৃত খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

i. **শুষ্ককরণ :** খাদ্যবস্তুকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা একটি প্রাচীন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু থেকে পানি শুকিয়ে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করা যায়। পাশাপাশি এনজাইম ক্রিয়াকে প্রতিহত করে অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে তিনি চাল, গম, ডাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করেন।

ii. **রেফ্রিজারেশন :** এ পদ্ধতিতে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ও এনজাইমের ক্রিয়া অল্প কিছুদিনের জন্য প্রতিরোধ করা যায়। তাই তিনি এ পদ্ধতিতে কাঁচা শাকসবজি, ফল, রান্না করা খাবার ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্য কিছুদিন সংরক্ষণ করেন।

iii. **ফ্রিজিং :** এ পদ্ধতিতে খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্যকে $0°$ ফারেনহাইট বা তার নিচের তাপমাত্রায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে তিনি টাটকা শাকসবজি, ফল, ফলের রস, মাছ, মাংস, প্রস্তুতকৃত খাবার দীর্ঘসময় সংরক্ষণ করতে পারেন।

iv. **সংরক্ষক দ্রব্য :** সঠিক পরিমাণের মাত্রা জেনে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে খাদ্যের পচন রোধ করা যায়। বিভিন্ন সংরক্ষক দ্রব্য যেমন– ভিনেগার ব্যবহার করে তিনি আচার, চাটনি, সস প্রভৃতির জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করেন।

v. **চিনি ও লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ :** চিনি ও লবণের ঘন দ্রবণ জীবাণুকে বহিঃঅভিস্রবণের দ্বারা অণুজীবগুলোকে ধ্বংস করে খাদ্যকে পচন থেকে রক্ষা করে। এ পদ্ধতিতে তিনি আচার, মাছ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারেন।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত মনছুরা খানম খাদ্য পচন রোধে ভিনেগার, সোডিয়াম বাই সালফেট ও বেনজোয়িক এসিডের লবণ ব্যবহার করে। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করায় তা ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে খাদ্যকে পচন থেকে রক্ষা করে। এগুলো দ্বারা খাদ্য সংরক্ষণ করলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। এছাড়া ফল, মাছ, মাংস, শাকসবজি, চাল, গম প্রভৃতি সংরক্ষণে তিনি শুষ্ককরণ, রেফ্রিজারেশন, চিনি বা লবণের দ্রবণ ব্যবহার করেন যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়।

অপরদিকে, ফল ব্যবসায়ী মুরাদ মিয়া ফল সংরক্ষণে ফরমালিন ব্যবহার করেন। ফরমালিন হচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে মানবদেহে নানা জটিল রোগ আক্রমণ করতে পারে। যেমন- বদহজম, পাতলা পায়খানা, পেটের নানা পীড়া, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, লিভার ও কিডনি নষ্ট হওয়াসহ ক্যানসারের মতো মরণব্যাধি পর্যন্ত হতে পারে। ফরমালিনের দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবহারে মেয়েদের গর্ভজাত সন্তান বিকলাঙ্গ হবারও সম্ভাবনা থাকে।

তাই বলা যায়, মনছুরা খানম ও মুরাদ মিয়ার খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে মনছুরা খানমের সংরক্ষণ পদ্ধতিটি জনস্বাস্থ্যকর।

**প্রশ্ন ▶ ০২** জমিলা খাতুন বাড়ির পাশের পুকুরের ঘোলা পানিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রান্নার উপযোগী করেন। অপরদিকে রতন সাহেব তার পানি বোতলজাতকরণ কারখানায় ও ঔষধ তৈরির কারখানায় পানিকে জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করেন।

ক. পানির স্ফুটনাঙ্ক কাকে বলে? ১

খ. জলজ উদ্ভিদ পানির স্রোতে ভেঙে যায় না কেন? ২

গ. জমিলা খাতুন পুকুরের পানিকে কীভাবে রান্নার উপযোগী করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রতন সাহেব তার দুই কারখানার কাজে ব্যবহার করা পানি কি একইভাবে জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করেন? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

[অধ্যায়-২ এর আলোকে]

**২নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** নির্দিষ্ট বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পানি যে তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়, তাকে পানির স্ফুটনাঙ্ক বলে।

**খ** জলজ উদ্ভিদসমূহ সারা দেহের মাধ্যমে পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান বিশেষ করে খনিজ লবণ সংগ্রহ করে থাকে। তাই এদের সমগ্র দেহ পানির সংস্পর্শে থাকে এবং এদের কাণ্ড ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব নরম হয় যা পানির স্রোত ও জলজ প্রাণীর চলাচলের সাথে মানানসই। এ কারণেই জলজ উদ্ভিদ পানির স্রোতে ভেঙে যায় না।

**গ** জমিলা খাতুন পরিস্রাবণ ও স্ফুটন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুকুরের ঘোলা পানিকে রান্নার উপযোগী করেন।

পরিস্রাবণ হলো তরল ও কঠিন পদার্থের মিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থকে আলাদা করার একটি প্রক্রিয়া। পানিতে অদ্রবণীয় ধুলা-বালির কণা থেকে শুরু করে নানা রকম ময়লা আবর্জনার কণা থাকে। এদেরকে পরিস্রাবণের মাধ্যমে পানি থেকে দূর করা যায়। এতে করে পানিতে অদ্রবণীয় ময়লার কণাগুলো বালির স্তরে আটকে যায়। এক্ষেত্রে তিনি বালির স্তর বা সূক্ষ্মভাবে তৈরি কাপড়ের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত করেন। এভাবে প্রাপ্ত ধুলা-বালি মুক্ত পানিকে আরও বিশুদ্ধকরণের জন্য তিনি পানিকে ২৫-২০ মিনিট ধরে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করেন। জমিলা খাতুন এভাবে পরিস্রাবণ ও স্ফুটন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘোলা পানিকে রান্নার উপযোগী করেন।

**ঘ** রতন সাহেব তার দুই কারখানার কাজে ব্যবহার করা পানি একইভাবে জীবাণুমুক্ত করেন না।

রতন সাহেবের দুটি কারখানা যথাক্রমে বোতলজাতকরণ কারখানা ও ঔষধ তৈরির কারখানা। বোতলজাতকরণ কারখানায় ব্যবহৃত পানিকে তিনি ক্লোরিনেশন পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এই প্রক্রিয়ায় পানিকে জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করতে ব্যবহার করেন ক্লোরিন গ্যাস ($Cl_2$)। এছাড়াও তিনি ওজন গ্যাস ও অতিবেগুনি রশ্মি প্রয়োগ করে পানিতে থাকা রোগজীবাণুকে ধ্বংস করেন। পক্ষান্তরে ঔষধ তৈরির কারখানায় পুরোপুরি বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন বিধায় তিনি পাতন পদ্ধতিতে পানি বিশুদ্ধকরণ করেন। এ পদ্ধতিতে একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করা হয়। পরে ঐ বাষ্পকে আবার ঘনীভূত করে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করা হয়। কারণ এ প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধকৃত পানিতে অন্য পদার্থ থাকার সম্ভবনা খুবই কম থাকে।

উপরিউক্ত বিশেষ কারণে রতন সাহেব তার দুই কারখানার কাজে ব্যবহার করা পানি একই পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত না করে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত করেন।

**প্রশ্ন ▸ ০৩**

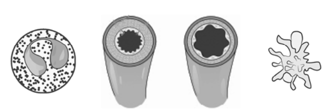

চিত্র-A চিত্র-B চিত্র-C

ক. লাইপোপ্রোটিন কাকে বলে? ১

খ. সিরাম বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের B চিত্রের তুলনামূলক গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে উদ্দীপকের A ও C এর মধ্যে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ? বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৩ এর আলোকে]

**৩নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** স্নেহ ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগকে লাইপোপ্রোটিন বলে।

**খ** রক্ত জমাট বাঁধার পর রক্তের জমাট অংশ থেকে যে হালকা হলুদ রঙের স্বচ্ছ রস পাওয়া যায় তাকে সিরাম বলে। সিরামে রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় প্রোটিন থাকে না। আবার কোনো রক্তকণিকা না থাকার জন্য এটি অভ্যন্তরীণ পরিবহণে অংশগ্রহণ করে না।

**গ** উদ্দীপকের চিত্র-B হচ্ছে রক্তনালি অর্থাৎ ধমনি ও শিরা। নিচে ধমনি ও শিরার তুলনামূলক গঠন ব্যাখ্যা করা হলো-

ধমনির মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয়। দেহে রক্তবাহী এ নালির প্রাচীর পুরু এবং তিনটি স্তরে গঠিত। এদের গহ্বর ছোট। ধমনিতে কপাটিকা না থাকার কারণে দ্রুত বেগে রক্ত প্রবাহিত হয়। ধমনির স্পন্দন আছে। ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পরিবাহিত হয়। এছাড়া ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে শুরু হয়ে কৈশিক জালিকায় শেষ হয়। অপরদিকে শিরার মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ডে আসে। রক্ত সংবহনের গুরুত্বপূর্ণ এ নালির প্রাচীর ধমনির মতো তিনটি স্তরে গঠিত হলেও এদের প্রাচীর বেশ পাতলা এবং গহ্বরটি বড়। শিরায় কপাটিকা থাকায় রক্ত ধীরে ধীরে একমুখে প্রবাহিত হয়। শিরা সাধারণত কৈশিক জালিকা থেকে শুরু হয় এবং হৃৎপিণ্ডে সমাপ্তি ঘটে।

**ঘ** উদ্দীপকের চিত্র-A ও চিত্র-C হচ্ছে যথাক্রমে শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা। শারীরিক সুস্থতার জন্য এ দুটি রক্তকণিকার ভূমিকা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

শ্বেত রক্তকণিকা গঠনগতভাবে এবং সাইটোপ্লাজমের দানার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের হয়। বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত ক্ষুদ্র কণিকা লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি গঠন করে যা দ্বারা দেহে প্রবেশ করা রোগজীবাণু ধ্বংস হয়। এটি দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্যের রক্ষাকবজ হিসেবে কাজ করে। আবার মনোসাইট ও নিউট্রোফিল ধরনের শ্বেত কণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে। ইওসিনোফিল ও বেসোফিল নামক শ্বেত কণিকা হিস্টামিন নামক পদার্থ নিঃসৃত করে দেহে এলার্জি প্রতিরোধ করে। বেসোফিল হেপারিন নিঃসৃত করে রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতরে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। এভাবে শ্বেত রক্তকণিকা দেহকে বিভিন্ন রোগজীবাণু হতে রক্ষা করে দেহকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

অপরদিকে, অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। যখন দেহের কোনো টিস্যু বা রক্তবাহিকা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কেটে যায় তখন উক্ত স্থানের অণুচক্রিকাগুলো সক্রিয় হয়ে থ্রম্বোপ্লাসটিন নামক এক ধরনের পদার্থ তৈরি করে। এটি রক্তের প্রোটিন প্রোথ্রমবিনকে থ্রমবিনে পরিণত করে যা পরবর্তীতে রক্তরসের প্রোটিন ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিন জালকে রূপান্তরিত করে রক্ত জমাট বাঁধায়। ফলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়। অতএব আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকার মধ্যে শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে শ্বেত রক্তকণিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ▸ ০৪** হাফিজ সাহেবের বিয়ের বয়স প্রায় দশ বছর। বহু ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়েও তিনি বাবা হতে পারেননি। তার বন্ধুর পরামর্শে হাফিজ সাহেব ও তার স্ত্রী বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভ্রূণ তৈরি করে স্ত্রীর জরায়ুতে স্থাপন করেন। অন্যদিকে হাফিজ সাহেবের ভাইয়ের মেয়েকে তার বাবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৪ বছর বয়সে বিয়ে দেন। এতে মেয়েটি বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়ে।

ক. নিষ্ক্রিয় অঙ্গা কাকে বলে? ১

খ. লিমুলাসকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বিশেষ প্রক্রিয়াটি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হাফিজ সাহেবের ভাইয়ের মেয়েটি কী ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৪ এর আলোকে]

**৪নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** নির্দিষ্ট জীবদেহে সক্রিয় কিন্তু সম্পর্কিত অপর জীবদেহে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে এমন অঙ্গাগুলোকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গা বলে।

**খ** কতকগুলো জীব সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করেও কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই এখনো পৃথিবীতে বেঁচে আছে, অথচ তাদের সমগোত্রীয় এবং সমসাময়িক জীবদের বিলুপ্তি ঘটেছে। এসব জীবগুলো হলো জীবন্ত জীবাশ্ম। লিমুলাস জীবাশ্মের উদ্ভব ঘটেছিল প্রায় ৪০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে। এর সাথের অন্যান্য আর্থ্রোপোডাগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এরা আজও বেঁচে আছে। তাই লিমুলাসকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী হাফিজ দম্পতির নেওয়া বিশেষ প্রক্রিয়াটি হলো ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন। নিচে এ প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করা হলো-

ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম উপায়ে দেহের বাইরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে প্রাথমিক ভ্রূণ সৃষ্টি করে সেটি নারীদের জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে শিশুর জন্মদান করা হয়। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তান ধারণে ব্যর্থ নারীদের এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। পর্যায়ক্রমে কতকগুলো প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ঘটিয়ে টেস্টটিউব বেবির জন্ম দেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে সক্ষম দম্পতি থেকে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ করে বিশেষ ধরনের পালন মাধ্যমে এদের মিলন ঘটানো হয়। অতঃপর পালন মাধ্যমে প্রাথমিক ভ্রূণ উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত ভ্রূণকে স্ত্রী জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রসূতির যথাযথ পরিচর্যা করে সন্তান লাভ সম্পন্ন করা হয়।

**ঘ** হাফিজ সাহেবের ভাইয়ের মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বাবার অপরিণত বয়সে বিয়ে দেওয়ায় সে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় পড়তে পারে বলে আমি মনে করি। নিচে এর কারণ বিশ্লেষণ করা হলো-

আমাদের দেশে আইন অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ের উপযুক্ত বয়স হলো ১৮ বছর। এ সময়ের পূর্বে মেয়েদের বিয়ে হলে অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ করে। এ বয়সে একটি মেয়ের মা হওয়ার মতো মানসিক ও শারীরিক পূর্ণতা থাকে না। অপ্রাপ্ত এ বয়সে মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি ও গঠন সম্পূর্ণ হয় না। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ, শরীরে পানি আসা, খুব বেশি ব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, গর্ভপাত ইত্যাদি ঘটে থাকে। এতে মা ও সন্তানের মৃত্যু ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ বয়সে গর্ভে সন্তান এলে সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্য গর্ভে পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। ফলে কম ওজনের শিশু জন্ম নেয় এবং তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। এছাড়া অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে সুস্থভাবে পরিবারের অন্যান্য কাজকর্ম করতে পারে না। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে শুরু থেকে শেষ সময় পর্যন্ত শারীরিক বিভিন্ন জটিলতার কারণে চিকিৎসকের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ থাকতে হয়। বারবার চিকিৎসকের নিকট শরণাপন্ন হওয়ার জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা ও ঔষধপত্র বাবদ অর্থের প্রয়োজন হয়। এতে পরিবারের উপর এক ধরনের আর্থিক চাপ পড়ে। এসব কারণে হাফিজ সাহেবের ভাইয়ের মেয়ের মানসিক চাপ বেড়ে যাবে এবং তার পরিবারে অশান্তি ও নানা রকম ঝামেলার সৃষ্টি হবে।

সুতরাং বলা যায়, হাফিজ সাহেবের ভাইয়ের মেয়েটি অপরিণত বয়সে বিয়ে দেওয়ার কারণে বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় পড়তে পারে।

**প্রশ্ন ▸ ০৫** চশমা ছাড়া হিরার মা পত্রিকার ছোট অক্ষরগুলো ঝাপসা দেখেন। কিন্তু দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখেন। অপরদিকে হিরা ২৫ সে. মি. দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পারে না। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার তাকে তার মায়ের বিপরীত ব্যবস্থাপত্র দেন।

ক. বেতার তরঙ্গা কাকে বলে? ১

খ. দ্রুত ঘুরন্ত বৈদ্যুতিক পাখা দেখা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হিরার চশমায় ব্যবহৃত লেন্সের ক্ষমতা নির্ণয় কর। ৩

ঘ. হিরা ও তার মায়ের ব্যবস্থাপত্র ভিন্ন হওয়ার কারণ– বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৫ এর আলোকে]

**৫নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ১ মি.মি. থেকে ১০০০০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত তরঙ্গাদৈর্ঘ্যের তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণকে বেতার তরঙ্গা বলে।

**খ** চোখের সামনে কোনো বস্তু রাখলে রেটিনায় তার প্রতিবিম্ব গঠিত হয় এবং আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই। বস্তুটিকে যদি চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়ার 0.1 s পর্যন্ত এর অনুভূতি মস্তিষ্কে থেকে যায়। ফলে আমাদের মস্তিষ্ক বৈদ্যুতিক পাখার চলনের দ্রুততা সহজে আলাদা করতে পারে না। তাই দ্রুত ঘুরন্ত বৈদ্যুতিক পাখার পাখা দেখা যায় না।

**গ** হিরা হ্রাস্বদৃষ্টি ত্রুটিতে আক্রান্ত। তার চশমায় ব্যবহৃত লেন্স হলো অবতল লেন্স।

উদ্দীপক হতে, ফোকাস দূরত্ব $= -$ ২৫ সে. মি. $= -\frac{২৫}{১০০} = -$ ০.২৫ মি.

[অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ঋণাত্মক]

লেন্সের ক্ষমতা = ?

আমরা জানি,

$$\text{লেন্সের ক্ষমতা} = \frac{১}{(\text{ফোকাস দূরত্ব})} = \frac{১}{(-\text{ ০.২৫ মি.})} = -\text{ ৪ ডায়প্টার}$$

সুতরাং, লেন্সটি অবতল তাই হিরার চশমায় ব্যবহৃত লেন্সের ক্ষমতা – ৪ ডায়প্টার।

**ঘ** হিরা ও তার মায়ের চোখের ত্রুটি হলো যথাক্রমে ক্ষীণদৃষ্টি ও দীর্ঘদৃষ্টি। চোখের সমস্যা একই ধরনের না হওয়ায় ডাক্তার তাদের ভিন্ন ব্যবস্থাপত্র দেন। এ ভিন্ন হওয়ার কারণ নিচে বিশ্লেষণ করা হলো–

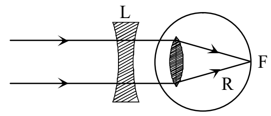

চিত্র : দীর্ঘদৃষ্টির প্রতিকার

হিরার চোখের অভিসারী ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার কারণে তার ক্ষীণদৃষ্টি ত্রুটি হয়েছিল। চোখের এ অভিসারী ক্ষমতা কমানোর জন্য অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে যার ফোকাস দূরত্ব ক্ষীণদৃষ্টি বা হ্রস্বদৃষ্টির দীর্ঘতম দূরত্বের সমান। এ চশমায় ব্যবহৃত লেন্সের অপসারী ক্রিয়া চোখের উত্তল লেন্সের অভিসারী ক্রিয়ার বিপরীতে ক্রিয়া করে। ফলে অসীম দূরত্বের বস্তু হতে নির্গত সমান্তরাল আলোকরশ্মি এ সাহায্যকারী অবতল লেন্স L এর মধ্য দিয়ে চোখে পড়ার সময় প্রয়োজনমতো অপসারিত হয়। এই অপসারিত রশ্মিগুলো চোখের লেন্সের প্রতিসরিত হয়ে ঠিক রেটিনা বা অক্ষিপট R এ উপর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি করে। ফলে বস্তুকে স্পষ্ট দেখা যায়।

আবার, হিরার মায়ের চোখের অভিসারী ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণে তার দীর্ঘদৃষ্টি ত্রুটি হয়েছিল। এ ত্রুটি দূর করার জন্য ডাক্তার তাকে উত্তল লেন্সের তৈরি চশমা ব্যবহার করতে বললেন। ফলে কাছাকাছি বিন্দু (N) হতে নির্গত আলোকরশ্মি চশমার লেন্সে এবং চোখের লেন্সে পর পর দুবার প্রতিসরিত হওয়ার কারণে ফোকাস দূরত্ব কমে যাবে এবং প্রয়োজনমতো অভিসারী হয়ে প্রতিবিম্বটি রেটিনা (R) এর উপর পড়বে। সে বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে পাবে।

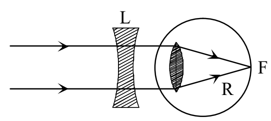

চিত্র : হ্রস্বদৃষ্টির প্রতিকার

সুতরাং চোখের সমস্যার তারতম্যের কারণে ডাক্তারের দেওয়া হিরা ও তার মায়ের ব্যবস্থাপত্র ভিন্ন হয়।

**প্রশ্ন ▸ ০৬** রানার বাবা গত বছর রানাকে এক ধরনের কাপড়ের তৈরি শার্ট কিনে দেন যার তন্তুগুলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রে নলের মতো দেখায়। এ বছর শীতে পরিধানের জন্য তার মা একটি সোয়েটার কিনে দেন যার তন্তুর মাঝে ফাঁকা জায়গা থাকে এবং কুঞ্চন প্রতিরোধের ক্ষমতা রয়েছে। তার জন্মদিনে মামা উপহার হিসেবে একটি পাঞ্জাবি কিনে দেন যার তন্তুগুলো এক প্রজাতির পোকার গুটি হতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আহরণ করা হয়।

ক. রাবার কাকে বলে? ১
খ. বাকেলাইটকে কেন থার্মোসেটিং প্লাস্টিক বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে মায়ের কিনে দেওয়া পোশাকের তন্তু কীভাবে সংগ্রহ করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গ্রীষ্মকালে পরিধানের জন্য বাবা ও মামার কিনে দেওয়া পোশাকের মধ্যে কোনটির ভূমিকা বেশি? তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

[অধ্যায়-৬ এর আলোকে]

**৬নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** যেসব পদার্থ স্থিতিস্থাপক ধর্ম প্রদর্শন করে, তাপ সংবেদনশীল হয় এবং তাপ দিলে আয়তন কমে তাদেরকে রাবার বলে।

**খ** থার্মোসেটিং প্লাস্টিককে তাপ দিলে নরম হয় না বরং পুড়ে শক্ত হয়ে যায়। এদেরকে একবারের বেশি ছাঁচে ফেলে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায় না। এ বৈশিষ্ট্য গুণের কারণে বাকেলাইটকে থার্মোসেটিং প্লাস্টিক বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে মায়ের কিনে দেওয়া পোশাকের তন্তু হলো পশম তন্তু। পশম তন্তু সংগ্রহ করার পদ্ধতি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

পশমি তন্তুসমূহ বিশেষ করে পশমি বস্ত্র তৈরির জন্য ব্যবহৃত পশম সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন প্রাণীর শরীর হতে। এতে প্রাণীর কোনো ক্ষতি হয় না। বিভিন্ন জাতের ভেড়া বা মেষের লোম থেকে পশম সংগ্রহ করা হয়। প্রায় ৪০ জাতের মেষ হতে ২০০ প্রকার পশম তৈরি করা হয়। জীবন্ত মেষ থেকে লোম সংগ্রহ করে যে পশম তৈরি করা হয় তাকে ফ্লিস উল এবং মৃত বা জবাই করা মেষ হতে যে পশম তৈরি করা হয় তাকে পুল্ড উল বলে। জীবিত মেষ বা ভেড়া হতে তন্তু সংগ্রহের পরও প্রাণী কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই বেঁচে থাকে এবং পুনরায় লোম গজায়। এভাবে একই পশুর গা থেকে একাধিকবার পশম সংগ্রহ করা যায়। এতে কোনো ক্ষতি না হলেও পশু নানারকম রোগ জীবাণু থেকে রক্ষা পায়।

**ঘ** রানার বাবার ও তার মামার কিনে দেওয়া পোশাকটি দুটি হলো যথাক্রমে সুতির শার্ট এবং রেশম তন্তু দ্বারা তৈরি পাঞ্জাবি। গ্রীষ্মকালে পরিধানের জন্য এদের মধ্যে সুতি কাপড়ের ভূমিকা বেশি। নিচে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে মতামত দেওয়া হলো-

আমরা জানি, সুতি কাপড়ের তাপ পরিবহন ও পরিচলন ক্ষমতা বেশি। ফলে সুতি কাপড়ের ভিতর দিয়ে তাপ সহজেই চলাফেরা করতে পারে। আবার সুতি সুতার তল মসৃণ হওয়ায় বাইরের বাতাস এ কাপড়ের মধ্য দিয়ে সহজেই প্রবেশ করতে পারে। যার ফলে গ্রীষ্মকালে সুতির পোশাক পরিধান করা আরামদায়ক।

অন্যদিকে, রেশম হালকা ও অধিকতর উষ্ণ এ কাপড়ের তাপ পরিবহন ও পরিচলন ক্ষমতা সুতি কাপড়ের চেয়ে কম। ফলে রেশমি কাপড়ের ভিতর দিয়ে তাপ সহজেই চলাফেরা করতে পারে না। অর্থাৎ এটি সুতি কাপড়ের চেয়ে অধিকতর উষ্ণ হওয়ায় গ্রীষ্মকালে পরিধান করলে গরম লাগবে।

অতএব বলা যায়, গ্রীষ্মকালে পরিধানের জন্য বাবার কিনে দেওয়া সুতি শার্টের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি।

**প্রশ্ন ▸ ০৭** 'M' যৌগটি পানিতে $H^+$ তৈরি করে। যৌগটির জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে। যৌগটির জলীয় দ্রবণে pH এর মান 7 এর কম।

ক. pH কী? ১
খ. ভিনেগারকে দুর্বল এসিড বলার কারণ কী? ২
গ. উদ্দীপকের যৌগটি যে শ্রেণির রাসায়নিক পদার্থ, প্রাত্যহিক জীবনে ঐ শ্রেণির যৌগসমূহের ব্যবহার লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকের যৌগটির অপব্যবহার রোধে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? তোমার মতামতসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৭ এর আলোকে]

### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ($H^+$) ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদমকে pH বলে।
অর্থাৎ $pH = -\log [H^+]$

**খ** এসিডসমূহ পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন ($H^+$) তৈরি করে। তবে জৈব এসিডসমূহ পানিতে পুরোপুরি বিয়োজিত হয় না। ভিনেগার একটি জৈব এসিড যা পানিতে আংশিক বিয়োজিত হয়। অর্থাৎ যতগুলো এসিডের অণু থাকে তার সবগুলো হাইড্রোজেন আয়ন ($H^+$) তৈরি করে না। এজন্য ভিনেগারকে দুর্বল এসিড বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের 'M' যৌগটি এসিড শ্রেণির রাসায়নিক পদার্থ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এসিডসমূহের গুরুত্ব নিচে বিশ্লেষণ করা হলো–

i. পরিষ্কারক তৈরিতে এসিড ব্যবহার করা হয়। যেমন– টয়লেট পরিষ্কারক তৈরিতে বড় একটি ভূমিকা পালন করে এসব এসিড।
ii. সৌর বিদ্যুৎ তৈরির জন্য সৌর প্যানেলে বা বাসাবাড়িতে আইপিএস চালানোর জন্য গাড়িতে যে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় তাতে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো সালফিউরিক এসিড ($H_2SO_4$)।
iii. ফসল উৎপাদনের জন্য সার হলো প্রয়োজনীয় উপাদান। আর সার তৈরিতে ব্যবহার করা হয় যথাক্রমে নাইট্রিক এসিড ($HNO_3$) ও সালফিউরিক এসিড ($H_2SO_4$)। এছাড়া অন্যান্য সার উৎপাদনেও এসব এসিডের ভূমিকা আছে।
iv. ধাতব শিল্পে ধাতু গলাতে এসব এসিড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
v. আমাদের দেহের জৈবিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রেও এসিড কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। যেমন, আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাকের জন্য HCl এসিড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
vi. শিল্পকারখানায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসিডের উপর নির্ভরশীল। $H_2SO_4$ কে শিল্পের রাজা বলা হয়। সাবান, রঞ্জক, পেট্রোলিয়াম শোধন, বিস্ফোরক প্রভৃতি শিল্পে এসিডের ব্যবহার অত্যধিক।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় প্রাত্যহিক জীবনে এসিডের গুরুত্ব অপরিসীম।

**ঘ** আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এসিডের যেমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে তেমনি এর ক্ষতিকর প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। মূলত এসিডের অপব্যবহারই এ ক্ষতিকর প্রভাবের কারণ। এজন্য অপব্যবহার রোধে প্রথমত এসিড বিক্রির দোকানগুলোর নিবন্ধিত করে তাদের এসিড বিক্রিতে বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে। ক্রেতার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে দোকানীকে এসিড বিক্রি করতে হবে। যত্রতত্র এসিড বিক্রি করলে কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে। এসিড ছোড়া মারাত্মক অপরাধ। বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী এসিড ছোড়ার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে জনসাধারণকে এর ভয়াবহ সম্পর্কে অবগত করতে হবে। সর্বোপরি উদ্দীপকের যৌগ এসিড এর অপব্যবহার রোধে গণসচেতনতা গড়ে তোলা উচিত।

**প্রশ্ন ▸ ০৮**

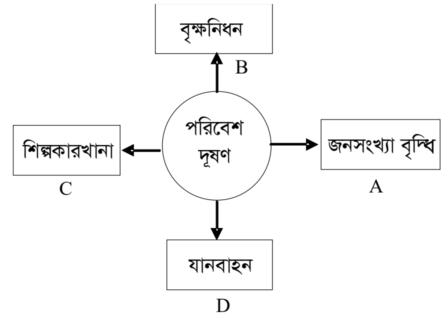


ক. বজ্রঝড় কী? ১
খ. নগরায়ন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য 'C' দায়ী- ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পরিবেশ সংরক্ষণে 'A' নিয়ন্ত্রিত হলে 'B' ও 'D' এর দূষণ রোধ সম্ভব হবে? মূল্যায়ন কর। ৪

[অধ্যায়-৯ এর আলোকে]

### ৮নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সাইক্লোনের মতো প্রচণ্ড বাতাস ঘূর্ণির আকারে প্রবাহিত হওয়াই হলো Torando বা Thunder strom বা বজ্রঝড়।

**খ** জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ জনসংখ্যার বড় একটি অংশ শহরমুখী হয়ে পড়েছে। গ্রামীণ জনপদের শহরমুখিতা এবং শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শহর এলাকায় আবাসন সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং এর ফলে আশেপাশের জমি ধ্বংস করে বা জলাভূমি ভরাট করা হচ্ছে। এটাই হচ্ছে নগরায়ন।

**গ** উদ্দীপকের C চিহ্নিত অংশটি হলো শিল্পকারখানা। শিল্পকারখানার ধোঁয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড ($CO_2$), কার্বন মনোক্সাইড (CO), সালফার ডাইঅক্সাইড ($SO_2$) এবং আরও নানা ধরনের ক্ষতিকারক বায়বীয় পদার্থ থাকে। এসব বায়বীয় পদার্থ বায়ুদূষণের জন্য দায়ী। বায়ুমণ্ডলে $CO_2$ এর পরিমাণ বাড়লে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া নামে পরিচিত। কার্বন ডাইঅক্সাইড এমন একটি গ্যাস, যা গ্রিন হাউসের কাচের দেয়ালের মতো কাজ করে। দিনের বেলায় সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে এবং ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। রাতে ভূপৃষ্ঠ থেকে সেই তাপ বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসা এবং ভূপৃষ্ঠ শীতল হওয়ার কথা। কিন্তু কিছু তাপ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের কারণে আটকা পড়ে। ফলে রাতের বেলায়ও পৃথিবী উষ্ণ থাকে। আর তাপ ধরে রাখার এ ঘটনাকেই গ্রিন হাউস প্রভাব বলে। শিল্প কারখানার সংখ্যা যতো বাড়বে কার্বন ডাইঅক্সাইডের নিঃসরণ ততো বাড়বে আর তার সাথে বাড়বে গ্রিন হাউস প্রভাব তথা বৈশ্বিক উষ্ণতা।

অতএব উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য শিল্পকারখানা দায়ী।

**ঘ** উদ্দীপকে A, B ও D তে যথাক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বৃক্ষনিধন ও যানবাহন দেখানো হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হলে বৃক্ষনিধন ও যানবাহনের দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের দেশে একটি অন্যতম সমস্যা। বাড়তি জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন বাড়তি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ

বাড়তি যানবাহন তথা পরিবহণ সুবিধা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাড়তি লোকের বাসস্থানের জন্য বনভূমি কেটে আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৫০ সালের পর থেকে শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শতকরা ৮০ ভাগ বনভূমি উজাড় হয়ে গেছে। সাথে সাথে হাজার হাজার বনজ গাছপালা ও জীবজন্তুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। বাড়তি জনসংখ্যার চাপ সামলানোর জন্য নতুন নতুন শিল্প-কারখানা তৈরি হচ্ছে যার কারণে আবাদি জমিসহ বনভূমি উজাড় বা নির্বিচারে বৃক্ষনিধন হচ্ছে। এতে করে প্রাকৃতিক উপায়ে গাছপালার দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইডের শোষণ কমে যাচ্ছে যার ফলে বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এছাড়াও অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যানবাহনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে যানবাহনের নির্গত ধোঁয়া বায়ু দূষণ এমনকি গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন ধরনের নিত্যনতুন সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। যদি এ জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা যায় তবে স্বাভাবিকভাবেই বৃক্ষনিধন কমে যাবে এবং যানবাহনের সংখ্যাও কমবে। ফলে এগুলোর দূষণ রোধ করা অনেকাংশে সম্ভব হবে।

**প্রশ্ন ▶ ০৯** ৮০০ কেজি ভরের একটি গাড়ি স্থির অবস্থায় আছে। ৮০ নিউটন বল দ্বারা ধাক্কা দেওয়ায় গাড়িটি কিছুদূর যাবার পর এক ধরনের বলের কারণে থেমে যায়।

ক. মহাকর্ষ বল কাকে বলে? ১

খ. চলন্ত বাসে ব্রেক কষলে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কেন? ২

গ. গাড়িটির ত্বরণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বলটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-১০ এর আলোকে]

### ৯নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মহাবিশ্বের সকল বস্তু তাদের ভরের কারণে একে অপরকে যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে তাকে মহাকর্ষ বল বলে।

**খ** চলন্ত বাস হঠাৎ ব্রেক কষলে যাত্রীরা গতি জড়তার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কারণ ব্রেক করে বাসকে স্থির করা হলে যাত্রীদের শরীরের বাস সংলগ্ন অংশ স্থির হয় কিন্তু শরীরের উপরের অংশ গতি জড়তার জন্য গতিশীল থাকে। তাই যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

**গ** উদ্দীপক হতে পাই, গাড়ির ভর, $m = ৮০০$ কেজি

প্রয়োগকৃত বল, $F = ৮০$ নিউটন

ত্বরণ, $a = ?$

আমরা জানি, $F = ma$

$$\text{বা, } a = \frac{F}{m} = \frac{৮০ \text{ নিউটন}}{৮০০ \text{ কেজি}}$$

$$= ০.১ \text{ মি./সে.}^২$$

অতএব, গাড়িটির ত্বরণ ০.১ মি./সে.$^২$।

**ঘ** উদ্দীপকে গাড়িটি কিছুদূর যাওয়ার পর ঘর্ষণ বলের কারণে থেমে যায়। এক্ষেত্রে গাড়ির চাকা এবং রাস্তার মধ্যকার ঘর্ষণ বল উৎপন্ন হয়। নিচের গাড়িটির থেমে যাওয়ার ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বলের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো :

দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থেকে যদি একে অপরের উপর দিয়ে চলতে চেষ্টা করে অথবা চলতে থাকে তাহলে বস্তুদ্বয়ের স্পর্শতলে এ গতির বিরুদ্ধে একটা বাধার উৎপত্তি হয়। এ বাধা হলো ঘর্ষণ। আর এ বাধার ফলে যে বল উৎপন্ন হয় তাকে ঘর্ষণ বল বলে। ঘর্ষণ বল যে দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হলো-

১. **বস্তুর ভর :** বস্তুর ভর বেশি হলে ঘর্ষণ বল বেশি উৎপন্ন হবে।

২. **পৃষ্ঠের প্রকৃতি :** পৃষ্ঠ অমসৃণ, খসখসে বা এবড়োথেবড়ো হলে ঘর্ষণ বল বেশি উৎপন্ন হবে।

রাস্তার তলে উঁচু-নিচু খাঁজ থাকে। গাড়ির চাকা যখন রাস্তার উপর দিয়ে গতিশীল হয় তখন গাড়ির চাকার এ খাঁজগুলো করাতের দাঁতের মতো একে অপরের সাথে আটকে যায়, ফলে রাস্তার তলের উপর দিয়ে গাড়ির চাকার তল বাধাপ্রাপ্ত হয়। একই সাথে গাড়ির ভর ঘর্ষণ বল উৎপন্ন করতে সহায়তা করে। এ ঘর্ষণ বল গাড়িটিকে কিছু পথ যাওয়ার পর চলমান গতিকে বাধা প্রদান করে। এভাবে ঘর্ষণ গাড়িটিকে রাস্তার উপর দিয়ে চলতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে এবং থামিয়ে দেয়।

সুতরাং বলা যায়, গাড়ির চাকা এবং রাস্তার মধ্যকার ঘর্ষণ বলের উৎপত্তির কারণে কিছুদূর যাওয়ার পর গাড়িটি থেমে যায়।

**প্রশ্ন ▶ ১০**

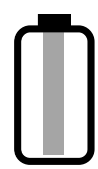

চিত্র-ক

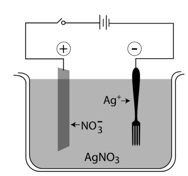


চিত্র-খ

ক. তড়িৎ বর্তনী কাকে বলে? ১

খ. এলইডি বালব সাধারণ বালবের চেয়ে বেশি সময় টিকে থাকে কেন? ২

গ. চিত্র-ক এর গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. চিত্র-ক ছাড়া চিত্র-খ এর কার্যক্রম পরিচালনা করা অসম্ভব- তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-১২ এর আলোকে]

### ১০নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** তড়িৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্ত হতে ঋণাত্মক প্রান্তে তড়িৎ প্রবাহের জন্য সম্পূর্ণ পথকে তড়িৎ বর্তনী বলে।

**খ** সাধারণ বাল্বে ধাতব ফিলামেন্টকে উত্তপ্ত করে আলো তৈরি করা হয়। এটি প্রচণ্ড তাপে নষ্ট হয়ে যায় বা ফিউজ হয়ে যায়। কিন্তু অধিকতর টেকসই ও মজবুত ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি এলইডি বালবে তাপ উৎপন্ন হলেও সহজে নষ্ট হয় না। এ বালবে শক্তি অপচয় কম হয় বলে এটি সাধারণ বালবের তুলনায় ৩ থেকে ২৫ গুণ বেশি সময় টিকে থাকে।

**গ** চিত্র-ক হলো ব্যাটারি। নিচে ব্যাটারির গঠন বর্ণনা করা হলো–
ব্যাটারি মূলত একাধিক তড়িৎ কোষের সমন্বয়। ব্যাটারি সেলে ব্যবহারের জন্য তড়িৎ শক্তি জমা থাকে। ব্যাটারিতে সাধারণত একটি অ্যানোড, একটি ক্যাথোড এবং মাঝখানে ইলেকট্রোলাইট এ তিনটি অংশ থাকে।

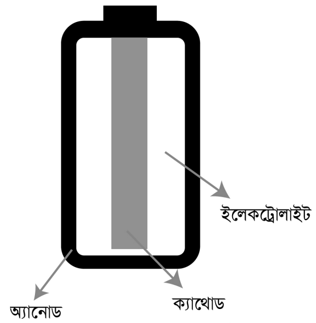

চিত্র : ব্যাটারির গঠন

ব্যাটারি সেলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অ্যানোড থেকে ইলেকট্রন সরিয়ে ক্যাথোডে জমা করা হয়। এর ফলে অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে তড়িৎ বিভব পার্থক্য তৈরি হয়। এ অবস্থায় অ্যানোড এবং ক্যাথোডকে পরিবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত করলে ক্যাথোডের ইলেকট্রনগুলো অ্যানোডে প্রবাহিত হতে থাকে। এভাবে ব্যাটারির মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। ব্যাটারি সেল যখন অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে বিভব পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না তখন বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাটারিকে চার্জ করার মাধ্যমে ব্যাটারি পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী হয়।

**ঘ** চিত্র-ক হচ্ছে ব্যাটারি এবং চিত্র-খ হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষণ। ব্যাটারি ছাড়া তড়িৎ বিশ্লেষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা অসম্ভব। বিষয়টি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো–

তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোনো দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করে এর অণুগুলোকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অংশে বিভক্ত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় কোনো ধাতুর উপর সুবিধামতো অন্য কোনো ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। চিত্র-খ এ দেখানো পাত্রে পানিতে বিদ্যমান $AgNO_3$ এর সিলভার ($Ag^+$) আয়নগুলো ব্যাটারির ক্যাথোডে প্রেরণ করে ইলেকট্রন গ্রহণ করার জন্য তড়িৎ প্রবাহিত করার প্রয়োজন হয়। এ তড়িৎ চালনা করতে তড়িৎ উৎস ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের দিকে কোষের অ্যানোড এবং ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে কোষের ক্যাথোড সংযুক্ত করতে হয়। ব্যাটারিতে সংযোগ দেওয়ার পর অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে তড়িৎ প্রবাহিত করলে ধাতুর লবণের তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে ক্যাথোডে রাখা ধাতব বস্তুর ওপর ধাতুর প্রলেপ পড়ে। তড়িৎ বিশ্লেষণের জন্য পরিবাহকের দুই পাশে ব্যাটারি কোষ দিয়ে বিভব পার্থক্য তৈরি করলে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। আর তড়িৎ প্রবাহিত না হলে তড়িৎ বিশ্লেষণ ঘটবে না। সুতরাং বলা যায়, তড়িৎ শক্তির অন্যতম উৎস হচ্ছে ব্যাটারি যা ছাড়া তড়িৎ বিশ্লেষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা অসম্ভব।

**প্রশ্ন ▸ ১১** মি. হক হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে গিয়ে দেখলেন ১ম কক্ষে এক ব্যক্তির মাথার সিটি স্ক্যান করা হচ্ছে। ২য় কক্ষে ও ৩য় কক্ষে দুইজন রোগীকে ক্যান্সার নিরাময়ের জন্য রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপি দেওয়া হচ্ছে।

ক. আল্ট্রাসনোগ্রাফি কী? ১
খ. এন্ডোসকপি করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ৩য় কক্ষে প্রদত্ত থেরাপির কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ১ম ও ২য় কক্ষে দেখা বিষয় দুটির মধ্যে কোনটি শরীরের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ? বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-১৪ এর আলোকে]

## ১১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আল্ট্রাসনোগ্রাফি হলো শরীরের অভ্যন্তরের নরম পেশিসমূহের ক্ষতি নিরূপণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত আলট্রাসাউন্ড/উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গ।

**খ** মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগ সঠিক উপায়ে নির্ণয়ের জন্য নানা ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। অস্ত্রোপচার না করে বাইরে থেকে শরীরের অভ্যন্তরে অঙ্গাপ্রত্যঙ্গাগুলোর ভেতর দেখার জন্য এন্ডোসকপি পরীক্ষা করা হয়। ফুসফুস, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, স্ত্রী প্রজনন অঙ্গা, উদর, পেলভিস, মূত্রনালির অভ্যন্তরভাগ, নাসাগহ্বর, নাকের চারপাশে সাইনাস এবং কানের বিভিন্ন সমস্যা এক্স-রে বা সিটি স্ক্যানে শনাক্ত করা যায় না। সেক্ষেত্রে শরীরের ভেতরের এসব অঙ্গাপ্রত্যঙ্গাসমূহের নিখুঁত ও স্পষ্ট ছবি পাওয়ার জন্য এন্ডোসকপি করা হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ৩য় কক্ষে প্রদত্ত থেরাপি হলো কেমোথেরাপি। কেমোথেরাপির কার্যপ্রণালি নিম্নরূপ–
প্রতিটি জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত। এ কোষ বৃদ্ধি পায় বা বিভাজিত হয়। জীবদেহের এ কোষ বিভাজনের ওপর ভিত্তি করে কেমোথেরাপি গঠিত হয়েছে। কেমোথেরাপিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক ঔষধ কোষ বিভাজনের নির্দিষ্ট ধাপে প্রয়োগ করা হয়। কোষ বিভাজনের কোন ধাপে কী প্রয়োগ করা হবে তার ওপর নির্ভর করে রাসায়নিক ঔষধগুলো ঠিক করা হয়। এটি নির্দিষ্ট সময় জুড়ে থাকে। যেমন– প্রতিদিনে ১ বার, সপ্তাহে ১ বার অথবা মাসে ১ বার প্রভৃতি। সাধারণত এভাবে প্রায় ৬ বার ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

**ঘ** উদ্দীপকের ১ম ও ২য় কক্ষে দেখা বিষয় দুটি যথাক্রমে সিটি স্ক্যান ও রেডিওথেরাপি। দুটি ক্ষেত্রেই এক্স-রে ব্যবহার করা হয় এবং এ এক্স-রে ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া উভয়ক্ষেত্রেই আছে কিন্তু রেডিওথেরাপিতে এ ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো–
সিটি স্ক্যানে ব্যবহৃত এক্স-রে গর্ভবতী নারীদের জন্য ক্ষতির কারণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও অন্য ক্ষেত্রে তা হয় না বললেই চলে। এতে এক্স-রে ব্যবহার করা হয় বলে খুব সামান্য তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হয়। এছাড়া ছবির কন্ট্রাস্ট বাড়ানোর জন্য যে ডাই ব্যবহৃত হয় তা কারো কারো শরীরে এলার্জির কারণ হতে পারে।
অন্যদিকে বাইরে থেকে রেডিওথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করার জন্যে সাধারণত একটি লিনিয়ার এক্সেলেটর ব্যবহার করে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এক্স-রে তৈরি করা হয়। এ রশ্মি শুধু ক্যান্সার আক্রান্ত কোষে পাঠানো সম্ভব হয় না বলে আশপাশের কিছু সুস্থ কোষও ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলে সুস্থ হওয়ার পরও ঐ ব্যক্তির যে কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায়। যে অঙ্গে রেডিওথেরাপি দেওয়া হয় ঐ অঙ্গের চামড়ায় বিভিন্ন সমস্যা যেমন- চুলকানি, এলার্জি বা ফোসকা পড়া ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।
সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, প্রথম কক্ষে দেখা সিটি স্ক্যান থেকে দ্বিতীয় কক্ষে দেখা রেডিওথেরাপি শরীরের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

## মডেল টেস্ট- ০৫

# বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| উত্তর | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | L | ২ | L | ৩ | L | ৪ | L | ৫ | N | ৬ | K | ৭ | L | ৮ | L | ৯ | M | ১০ | N | ১১ | K | ১২ | K | ১৩ | K | ১৪ | M | ১৫ | L |
| | ১৬ | L | ১৭ | N | ১৮ | M | ১৯ | K | ২০ | M | ২১ | N | ২২ | L | ২৩ | L | ২৪ | N | ২৫ | M | ২৬ | M | ২৭ | K | ২৮ | L | ২৯ | M | ৩০ | L |

# সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▶ ০১** ইদানীং মারুফের খাওয়ার প্রতি আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। সবসময় কর্মবিমুখতা ও হতাশা লক্ষ করা যায়। সে নিয়মিত স্কুলেও যায় না এবং গভীর রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়। সে প্রায়ই মায়ের কাছে টাকার জন্য বায়না ধরে এবং বাবার পকেট থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়। মারুফের পিতামাতা ও শিক্ষক তার এরূপ আচরণের জন্য চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন।

ক. Fruit Sugar কী? ১

খ. ভিটামিন দেহের জন্য প্রয়োজন কেন? ২

গ. কী কী পরিবেশগত কারণে মারুফের এ পরিণতি হতে পারে, ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মারুফকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে তার পিতামাতা ও শিক্ষকের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-১ এর আলোকে]

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বিভিন্ন মিষ্টি ফল ও ফুলে প্রাপ্ত ফ্রুক্টোজই হলো Fruit Sugar.

**খ** ভিটামিনের অভাবে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন বা দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াগুলো ব্যাহত হয়। খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ এ উপাদানটির অনুপস্থিতিতে শরীরে সহজেই বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেটস, রাতকানা প্রভৃতি রোগ আক্রান্ত হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রবণতা দেখা দেয়। তাই দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, পুষ্টি এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য ভিটামিন প্রয়োজন।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো থেকে বলা যায়, মারুফ একজন মাদকাসক্ত বালক। মারুফের মাদকাসক্ত হওয়ার জন্য পরিবেশগত বিভিন্ন দিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

মারুফ যে পরিবেশে বড় হয়েছে সেখানে হয়তো মাদকের রমরমা ব্যবসা সহজলভ্যতা ছিল। মাদক নিয়ন্ত্রণে কোনো আইনের প্রয়োগ ছিল না। তাছাড়া সমাজে মাদকের ক্ষতিকারক দিক সম্বন্ধে জনসাধারণের জন্য সচেতনতামূলক প্রচারণার অভাব ও সমাজপতিদের উদাসীনতা মারুফের এ পরিণতির জন্য দায়ী। এছাড়া সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ উঠে গিয়ে পাশ্চাত্যের প্রভাব এক্ষেত্রে মারুফের এ পরিণতির জন্য ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যদিকে সমাজে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে বেকাররা। আর এ হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় পিতামাতার অবাধ্য সন্তানেরা মাদক সেবন করছে।

সুতরাং উপর্যুক্ত পরিবেশগত কারণে মারুফের মাদকের প্রতি আকর্ষণ জন্মাতে পারে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো অনুযায়ী মারুফ মাদকাসক্ত হয়ে অস্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করেছে। মারুফকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে তার পিতামাতা ও শিক্ষকের যেসব পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা হলো−

i. প্রথমেই মারুফকে তার ড্রাগ নেওয়া বন্ধুদের কাছ থেকে আলাদা করতে হবে।

ii. পিতামাতাকে মারুফের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কথা বলে তার সমস্যা সম্পর্কে জানতে হবে।

iii. প্রয়োজনে তাকে মাদক নিরাময় হাসপাতাল বা কেন্দ্রে ভর্তি করাতে হবে।

iv. অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে তাকে চিকিৎসা করাতে হবে।

v. তার হতাশা দূর করার জন্য পিতামাতা ও শিক্ষককে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে।

vi. মাদক সেবনে শারীরিক প্রভাব সম্পর্কে পিতামাতা ও শিক্ষক তাকে অবহিত করবে।

vii. পূর্বের চেয়ে বাবা-মাকে মারুফের প্রতি আরও যত্নশীল হতে হবে।

viii. তাকে এমন মানসিক চিকিৎসা করাতে হবে যাতে করে সে ড্রাগের কথা মনে না করতে পারে।

ix. সামাজিক অপরাধ থেকে দূরে রাখতে শিক্ষক তাকে বিদ্যালয়ে পাঠদানের পাশাপাশি মাদক সেবনে নিরুৎসাহিত করবে।

x. মাদকের বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিক ও এর ব্যবহারে আইনের শাস্তি সম্পর্কে তাকে ভালোভাবে অবগত করাতে হবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে মারুফকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

**প্রশ্ন ▶ ০২** A = বুড়িগঙ্গা, তুরাগ।

B = ট্যানারি ও কলকারখানার বর্জ্য।

ক. রামসার কনভেনশন কী? ১

খ. ক্লোরিনেশন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দূষণে 'B' এর প্রভাব বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'A' দূষণ রোধে জনসচেতনতাই প্রধান− বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-২ এর আলোকে]

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারিতে ইরানের রামসারে ইউনেস্কোর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নেওয়া জলাভূমি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে রামসার কনভেনশন।

**খ** বিভিন্ন উৎসের পানিতে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু দূর করতে নানারকম জীবাণুনাশক ব্যবহার করা হয়। পানি বিশুদ্ধকরণের কাজে ব্যবহৃত ক্লোরিন ($Cl_2$) গ্যাস এদের মধ্যে অন্যতম। এছাড়া ব্লিচিং পাউডার [$Ca(OCl)Cl$], সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড ($NaOCl$) ইত্যাদি ক্লোরিনসমৃদ্ধ যৌগ এ কাজে ব্যবহার করা হয়। যৌগগুলোতে বিদ্যমান ক্লোরিন পানিতে বিদ্যমান রোগজীবাণু ধ্বংস করে। পানি বিশুদ্ধকরণের এ প্রক্রিয়াটি হলো ক্লোরিনেশন।

**গ** উদ্দীপকে নির্দেশিত 'A' হলো বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদী। এ দুটি নদী দূষণে 'B' অর্থাৎ ট্যানারি ও কারখানার বর্জ্য সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। নিচে তা বর্ণনা করা হলো−

বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর তীরে গড়ে উঠা নানা রকম শিল্পকারখানা থেকে নানা ধরনের রাসায়নিক বর্জ্য ও অন্যান্য শিল্প বর্জ্য ফেলা হয়। এসব বর্জ্য পদার্থে থাকে সিসা, পারদ ইত্যাদি থেকে শুরু করে এসিড,

ক্ষার ও বিভিন্ন প্রকার লবণ। এসব বিষাক্ত উপাদানসমৃদ্ধ শিল্পকারখানার বর্জ্য যদি পানিতে ফেলা হয় তবে তা পানিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। এসব পানি ব্যবহার করলে টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয়, সংক্রামক হেপাটাইটিস বি ইত্যাদি পানিবাহিত রোগ হয়। এছাড়া পানিতে পারদ, সিসা, আর্সেনিক থাকলে মস্তিষ্ক, ত্বকসহ শরীরের নানা রকম রোগ দেখা দেয়। এছাড়া ট্যানারি শিল্পের বর্জ্যও এসব নদীতে ফেলা হয়। ট্যানারি শিল্পের পশুর চামড়া, রক্ত ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু থাকে যা পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে। ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর পানি দূষিত হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে কলকারখানা ও ট্যানারির বর্জ্যগুলো প্রধান ভূমিকা রেখেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে 'A' অর্থাৎ বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদী দুটির পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ দূষণ রোধ করা সম্ভব। যেমন–

i. শিল্পকারখানার বর্জ্য নির্গত করার সময় পানিদূষণে ভূমিকা রাখতে না পারে। এমনভাবে রাসায়নিক ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা করতে হবে।
ii. প্লাস্টিক, পলিথিন জাতীয় পদার্থ জলাভূমিতে না ফেলা এবং এসব সামগ্রী দ্বারা পানি দূষণ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে।
iii. জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে এবং কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং এদের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে হবে। জৈব সার ব্যবহার করতে হবে।
iv. জলাভূমি ও বনভূমি রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
v. নৌযান যেমন– লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ হতে নির্গত বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে হবে।

উপরের সচেতনতামূলক কাজগুলোর মাধ্যমে এ দুটি নদীর দূষণ অনেকাংশে কমানো সম্ভব। তাই বলা যায়, 'A' দূষণ রোধে জনসচেতনতাই প্রধান।

**প্রশ্ন ▸ ০৩** আমাদের দেহে অনেক অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি পাম্পের মতো সারাদেহে অক্সিজেন পৌঁছে দেয় এবং দেহ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ফুসফুসে পৌঁছে দেয়।

ক. Rh "ফ্যাক্টর" কাকে বলে? ১
খ. শ্বেত রক্তকণিকা কীভাবে দেহের প্রহরী স্বরূপ কাজ করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গাটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গাটির যে নালিকাদ্বয় অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত বহন করে তাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৩ এর আলোকে]

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রেসাস নামক বানরের লোহিত রক্তকণিকায় অবস্থিত এক ধরনের অ্যান্টিজেন যা অনেক মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় পাওয়া যায় তাকে Rh 'ফ্যাক্টর' বলে।

**খ** দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করলে শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে। মনোসাইট ও নিউট্রোফিল শ্বেত রক্তকণিকা এ প্রক্রিয়ায় ভক্ষণ করে জীবাণুকে ধ্বংস করে। লিম্ফোসাইট শ্বেত রক্তকণিকা অ্যান্টিবডি গঠন করে দেহের ভিতরের জীবাণু ধ্বংস করে এবং বাইরের জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করে। এভাবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে শ্বেত রক্তকণিকাকে দেহের প্রহরী বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গাটি হলো হৃৎপিণ্ড। নিচে এর গঠন ব্যাখ্যা করা হলো–

হৃৎপিণ্ড রক্ত সংবহনতন্ত্রের অন্তর্গত এক রকম পাম্প যন্ত্রবিশেষ। মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষগহ্বরে ফুসফুস দুটির মাঝখানে এবং মধ্যচ্ছদার উপরে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডের প্রশস্ত প্রান্তটি উপরের দিকে এবং সুচালো প্রান্তটি নিচের দিকে বিন্যস্ত থাকে। হৃৎপিণ্ড দ্বিস্তরী পেরিকার্ডিয়াম পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে।

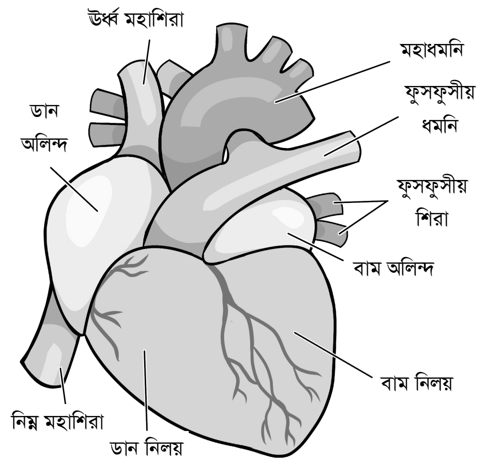


চিত্র : হৃৎপিণ্ডের গঠন

উভয় স্তরের মাঝে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড থাকে যা হৃৎপিণ্ডকে সংকোচনে সাহায্য করে। মানুষের হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে যথাক্রমে ডান ও বাম অলিন্দ এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে যথাক্রমে ডান ও বাম নিলয় বলে। অলিন্দ দুটি আন্তঃঅলিন্দ পর্দা দিয়ে এবং নিলয় দুটি আন্তঃনিলয় পর্দা দ্বারা পৃথক থাকে। দুটি অলিন্দের ভেতরের প্রাচীর পাতলা এবং নিলয় দুটির প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। ডান অলিন্দের সঙ্গে একটি উর্ধ্ব মহাশিরা এবং একটি নিম্ন মহাশিরা যুক্ত থাকে। বাম নিলয়ের সঙ্গে চারটি ফুসফুসীয় শিরা যুক্ত থাকে। ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনি এবং বাম নিলয় থেকে মহাধমনি উৎপন্ন হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গাটি হলো হৃৎপিণ্ড। মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ এ অঙ্গাটির মধ্যদিয়ে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্তবাহিত নালিদ্বয় যথাক্রমে ধমনি ও শিরা। নিচে ধমনি ও শিরার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো–

ধমনির প্রাচীর পুরু এবং তিন স্তরবিশিষ্ট। এদের গহ্বর ছোট। অপরদিকে শিরার প্রাচীর ধমনির মতো তিন স্তরে গঠিত হলেও এদের প্রাচীর বেশ পাতলা এবং গহ্বর বড়। ধমনিতে কোনো কপাটিকা না থাকায় এবং গহ্বর ছোট হওয়ায় এদের মধ্য দিয়ে রক্ত বেগে প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে শিরায় কপাটিকা থাকায় এদের মধ্য দিয়ে রক্ত ধীরে ধীরে একমুখে প্রবাহিত হয়। শুধুমাত্র পালমোনারি ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে $CO_2$ সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে নিয়ে আসে এবং পালমোনারি শিরা অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। ধমনির রক্তপ্রবাহ দ্রুতগতি সম্পন্ন হলেও শিরার রক্তপ্রবাহ ধীর গতি সম্পন্ন। আবার ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে শুরু হয়ে কৈশিক জালিকায় শেষ হয়। পক্ষান্তরে শিরা কৈশিক জালিকা থেকে শুরু হয়ে হৃৎপিণ্ডে সমাপ্তি ঘটে। এছাড়া ধমনির স্পন্দন থাকলেও শিরার স্পন্দন নেই।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, রক্ত সংবহনের নালি দুটি ধমনি ও শিরার গঠন ও কার্যধারায় যথেষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

**প্রশ্ন ▶ ০৪** (i) বৈজ্ঞানিক মতবাদ–১ : একটি প্রজাতি থেকে অপর একটি প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

(ii) বৈজ্ঞানিক মতবাদ–২ : প্রতিটি জীবই অস্তিত্বের জন্য প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

ক. ল্যামার্কিজম কী? ১

খ. প্লাটিপাস জীবন্ত জীবাশ্ম ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বৈজ্ঞানিক মতবাদ-১ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ডারউইন প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদ-২ এর নাম উল্লেখপূর্বক এর তিনটি পর্যায় বর্ণনা কর। ৪

[অধ্যায়-৪ এর আলোকে]

**৪নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ল্যামার্কের তত্ত্ব হলো ল্যামার্কিজম।

**খ** কতকগুলো জীব সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করেও কোনোরকম পরিবর্তন ছাড়াই এখনো পৃথিবীতে বেঁচে আছে, অথচ তাদের সমগোত্রীয় এবং সমসাময়িক জীবদের বিলুপ্তি ঘটেছে। এ সকল জীবদের জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। প্লাটিপাসের সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় প্রাণীরা কালের আবর্তে পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হতে সক্ষম না হওয়ায় ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোনো পরিবর্তন ছাড়াই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে প্লাটিপাস পৃথিবীতে আজও বেঁচে আছে। তাই প্লাটিপাস একটি জীবন্ত জীবাশ্ম।

**গ** উদ্দীপকের বৈজ্ঞানিক মতবাদ-১ হলো "একটি প্রজাতি থেকে অপর একটি প্রজাতির সৃষ্টি হয়"– যা জৈব বিবর্তনকে নির্দেশ করে।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে কোনো জীবের পরিবর্তনের ফলে এটি দ্বারা নতুন কোনো প্রজাতি সৃষ্টি হওয়াকে বুঝানো হয়। বিজ্ঞানী ল্যামার্ক কয়েকটি প্রধান প্রতিপাদ্যের উপর ভিত্তি করে তত্ত্ব প্রদান করেন। ল্যামার্কের তত্ত্ব অনুযায়ী অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের জন্য এবং প্রতিটি প্রজন্মে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জিত হওয়ায় ধীরে ধীরে একটি প্রজাতি থেকে অপর একটি নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়। ল্যামার্ক কতকগুলো পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তাঁর মতবাদ রচনা করেছিলেন। তাঁর দেওয়া কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে মতবাদটির সপক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো–

i. ক্রমাগত পানিতে সাঁতার কাটার ফলে জলজ পাখির পায়ের আঙুলের অন্তর্বর্তী স্থানগুলো পাতলা চামড়া দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায় লিপ্তপদে পরিণত হয়েছে।

ii. সাপের পূর্বপুরুষদের গিরগিটির মতো চারটি পা ছিল। কিন্তু গর্ত ও ফাটলে বাস করার জন্য পায়ের ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে বর্তমান এ বৈশিষ্ট্যটি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়েছে।

iii. জিরাফের সুদীর্ঘ গ্রীবা, খুব উঁচু গাছ থেকে পাতা সংগ্রহের জন্য অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের ফলেই ঘটেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ-২ হলো প্রতিটি জীবই অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ডারউইনের মতবাদের প্রদত্ত বিষয়টি জীবের জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় এবং খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় জীবকে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ডারউইন এ ধরনের সংগ্রামকে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেন। ডারউইন লক্ষ করেন যে, জীবকে তিনটি পর্যায়ে সংগ্রাম করতে হয়। নিচে পর্যায় তিনটি বর্ণনা করা হলো–

**i. আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম :** জৈবিক কারণে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কযুক্ত একটি নিষ্ঠুর জীবন সংগ্রাম গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যাঙ এক দিকে কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করে, অন্যদিকে তেমনি ব্যাঙেরা সাপ কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আবার ময়ূর কর্তৃক ব্যাঙ ও সাপ উভয়েই ভক্ষিত হয়।

**ii. অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম :** একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের খাদ্য ও বাসস্থান অভিন্ন হওয়ায় তাদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে নিজেদের মধ্যেই বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একটি দ্বীপে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পেলে খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সবল প্রাণীগুলো দুর্বল প্রাণীদের প্রতিহত করে গ্রাসাচ্ছাদন করে। ফলে দুর্বল প্রাণীগুলো কিছুদিনের মধ্যেই অনাহারে মারা পড়ে।

**iii. পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম :** বন্যা, খরা, ঝড়, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি প্রতিকূল পরিবেশ জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। সুতরাং জীবকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এসব প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। যে প্রাণীগুলো এই পরিবেশে টিকে থাকতে পারে তারা বেঁচে থাকে অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উত্তর ও মধ্য আমেরিকার কোয়েল পাখি প্রচণ্ড ঠান্ডা ও তুষারপাতের ফলেই বিলুপ্ত হয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ০৫** নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

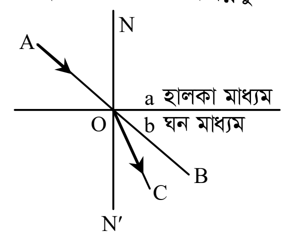


ক. আপতন কোণ কাকে বলে? ১

খ. স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব বলতে কী বোঝ? ২

গ. AO রশ্মি OB পথে না গিয়ে OC পথে গমনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মাধ্যমদ্বয় বিপরীত হলে সেক্ষেত্রে কী ঘটবে চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৫ এর আলোকে]

**৫নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** আলোর প্রতিসরণের ফলে আপতিত রশ্মি এবং অভিলম্বের মধ্যবর্তী কোণকে আপতন কোণ বলে।

**খ** চোখের সবচেয়ে কাছে যে বিন্দু পর্যন্ত চোখ লক্ষ্যবস্তুকে খালি চোখে স্পষ্ট দেখতে পায় তাকে স্পষ্ট দৃষ্টির নিকট বিন্দু বলে এবং চোখ হতে ঐ বিন্দুর দূরত্বকে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব বলে। এ দূরত্ব মানুষের বয়সের সাথে পরিবর্তিত হয়। যেমন– একজন শিশুর স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব ৫ সেন্টিমিটার কিন্তু একজন স্বাভাবিক বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে এ দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার।

**গ** আলোর প্রতিসরণ ধর্মের কারণে চিত্রে AO আপতিত রশ্মি সরাসরি OB পথে না গিয়ে OC পথে গমন করে। এটির কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

আমরা জানি, আলোকরশ্মি কোনো স্বচ্ছ ও সমসত্ব মাধ্যমে সর্বদা সরলরেখায় চলে। কিন্তু আলো যখন একটি স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে লম্বভাবে আপতিত না হয়ে বাঁকাভাবে আপতিত হয়, তখন মাধ্যম দুটির বিভেদতলে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। এখানে, প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের ঘনত্ব বেশি হলে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের দিকে সরে যাবে। অপরদিকে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে

দ্বিতীয় মাধ্যমের ঘনত্ব কম হলে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে। তাই চিত্রে AO আপতিত রশ্মি হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রতিসরিত হওয়ায় সরাসরি OB পথে না গিয়ে অভিলম্বের দিকে সরে এসে OC পথে প্রতিসরিত হয়।

**ঘ** উদ্দীপকের চিত্রে প্রথম মাধ্যম হালকা এবং দ্বিতীয় মাধ্যম ঘন। মাধ্যমদ্বয় বিপরীত হলে অর্থাৎ প্রথম মাধ্যম ঘন এবং দ্বিতীয় মাধ্যম হালকা হলে যা ঘটবে নিম্নে চিত্রসহ তা বিশ্লেষণ করা হলো–

আলো যখন একটি স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে লম্বভাবে আপতিত না হয়ে বাঁকাভাবে আপতিত হয়, তখন মাধ্যম দুটির বিভেদতলে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। প্রথম মাধ্যম হালকা এবং দ্বিতীয় মাধ্যম ঘন হলে, প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের দিকে সরে যাবে। অপরদিকে প্রথম মাধ্যম ঘন এবং দ্বিতীয় মাধ্যম হালকা হলে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে।

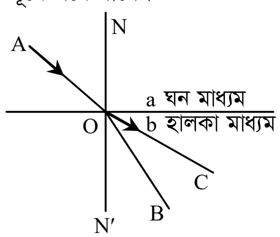


তাই বলা যায়, মাধ্যমদ্বয় বিপরীত হলে অর্থাৎ প্রথম মাধ্যম ঘন ও দ্বিতীয় মাধ্যম হালকা হলে, ঘন মাধ্যম থেকে AO আপতিত রশ্মি O বিন্দুতে আপতিত হয়ে হালকা মাধ্যমে OB পথে না গিয়ে অভিলম্ব NN′ থেকে দূরে সরে গিয়ে OC পথে প্রতিসরিত হবে।

**প্রশ্ন ▸ ০৬** ডিসেম্বরের এক সকালে প্রজ্ঞা ঘরের বাইরে বের হলো। তার পরনে ছিল পলু পোকা নামক এক প্রজাতির গুঁটি থেকে তৈরি পোশাক। তাই তার বেশ ঠান্ডা লাগছিল।

ক. তন্তু কী? ১
খ. সুতি বস্ত্র বলতে কী বুঝায়? ২
গ. প্রজ্ঞার পরিধেয় বস্ত্রে ব্যবহৃত তন্তুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রজ্ঞার কোন ধরনের তন্তুর পোশাক পরার দরকার ছিল? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

[অধ্যায়-৬ এর আলোকে]

### ৬নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বয়নশিল্পে বুনন ও বয়নের কাজে ব্যবহৃত আঁশসমূহই হলো তন্তু।

**খ** সুতি বস্ত্র বলতে সুতি সুতা থেকে তৈরি বস্ত্রকে বুঝায়। সুতি সুতার তাপ পরিবহন ও পরিচলন ক্ষমতা বেশি বলে সুতি বস্ত্রের ভিতর দিয়ে সহজেই তাপের আদান-প্রদান হয়। সুতি বস্ত্র টেকসই হলেও আপাতদৃষ্টিতে এর উজ্জ্বলতা কম। অজৈব এসিডের সংস্পর্শে সুতি তন্তু নষ্ট হলেও অন্যান্য এসিডের সংস্পর্শে এর তেমন ক্ষতি হয় না। সুতি বস্ত্রের প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো এর সংকোচনশীলতা।

**গ** প্রজ্ঞার পরিধেয় বস্ত্র রেশম বা পলু পোকা নামক গুটি থেকে সংগ্রহ করা হয়। নিচে রেশম তন্তুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো–

রেশম মূলত ফাইব্রেয়ন নামক প্রোটিন জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। প্রাকৃতিক প্রাণিজ তন্তুর মধ্যে এটি সবচেয়ে শক্ত ও দীর্ঘ। বিভিন্ন গুণাগুণের জন্য রেশমকে তন্তুর রানি বলা হয়। সূর্যালোকে এ তন্তু দীর্ঘক্ষণ রাখলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। এটি হালকা কিন্তু অধিকতর উষ্ণ এবং খুবই কম পরিসরে রাখা যায়।

**ঘ** প্রজ্ঞার পশম তন্তুর পোশাক পরার দরকার ছিল। এ প্রসঙ্গে আমার মতামত যুক্তিসহ নিচে উপস্থাপন করা হলো–

ডিসেম্বর মাস বছরের অন্যতম শীতলতম মাস। এ মাসে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে। রেশম হালকা উষ্ণ হওয়ার পরও ঠান্ডা বেশি থাকায় প্রজ্ঞার ঠান্ডা লাগছিল। এজন্য তার এমন তন্তুর পোশাক পরা দরকার ছিল যা তাকে উষ্ণ রাখবে। পশম এ ধরনেরই তন্তু। পশম তন্তুর মাঝে ফাঁকা জায়গা থাকায় সেখানে বাতাস আটকে থাকতে পারে। পশম তাপ কুপরিবাহী হওয়ায় শীতের দিনে শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না। তাই গায়ে দিলে গরমবোধ হয়।

অতএব উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, পশম তন্তুর পোশাকই প্রজ্ঞার জন্য উপযুক্ত পোশাক যা তার পরার দরকার ছিল।

**প্রশ্ন ▸ ০৭** দীপ্তির হাতে একদিন বিচ্ছু কামড় দিল। যন্ত্রণায় সে চিৎকার করতে লাগল। এ অবস্থা দেখে তার ছোট ভাই এসে তাড়াতাড়ি টুথপেস্ট লাগিয়ে দিল। অন্যদিকে তার বাবা পেটের ব্যথায় অস্থির। তিনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দুই গ্লাস কমলার রস পান করেন।

ক. দুর্বল এসিড কাকে বলে? ১
খ. লবণকে কেন নিরপেক্ষ পদার্থ বলা হয়? ২
গ. দীপ্তির বাবার পেটের ব্যথার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. টুথপেস্ট দেওয়ার পর দীপ্তির শরীরে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৭ এর আলোকে]

### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যেসব এসিড পানিতে পুরোপুরিভাবে বিয়োজিত না হয়ে আংশিকভাবে বিয়োজিত হয় অর্থাৎ যতগুলো এসিডের অণু থাকে তার সবগুলো হাইড্রোজেন আয়ন ($H^+$) তৈরি করে না, তাদেরকে দুর্বল এসিড বলে।

**খ** যেসব পদার্থ তার জলীয় দ্রবণে নির্দেশক বা লিটমাস কাগজের রঙের কোনো পরিবর্তন করে না তাদেরকে নিরপেক্ষ পদার্থ বলে। লবণের জলীয় দ্রবণে লাল ও নীল লিটমাস কাগজের রঙের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই লবণকে নিরপেক্ষ পদার্থ বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে দীপ্তির বাবার পেটে ব্যথার কারণ হলো পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। পাকস্থলীর এসিডিটির জন্য পেটে ব্যথার কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :

পাকস্থলীতে খাদ্য হজম করার জন্য আমাদের হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রয়োজন হয়। আর কোনো কারণে যদি এ এসিডের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন ঐ অবস্থাকে পাকস্থলীর এসিডিটি বলে। নানা কারণে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে, যার মধ্যে অন্যতম হলো খাদ্যদ্রব্য। আমরা যেসব পানীয় বা ফলের রস পান করি, তার প্রায় সবই অম্লীয়। কাজেই এসব পানীয় বেশি মাত্রায় পান করলে বা খালি পেটে পান করলে তা এসিডিটি সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে দীপ্তির বাবা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দুই গ্লাস কমলার রস পান করেন। খালি পেটে কমলার রস পান করলে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়। যা পরবর্তীতে পেটে ব্যথার সৃষ্টি করে। সুতরাং খালি পেটে কমলার রস পান করার কারণেই দীপ্তির বাবার পেটে ব্যথা হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে দীপ্তির হাতে বিচ্ছু কামড় দিলে সে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল। কেননা বিচ্ছুর হুলে থাকে হিস্টামিন নামক ক্ষারক পদার্থ। যা শরীরে জ্বালার সৃষ্টি করে। এ অবস্থা দেখে দীপ্তির ছোট ভাই এসে তাড়াতাড়ি টুথপেস্ট লাগিয়ে দিল, যা একটি ক্ষারীয় পদার্থ। নিম্নে টুথপেস্ট দেওয়ার পর দীপ্তির শরীরের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হলো :

বিচ্ছু কামড় দিলে প্রচণ্ড জ্বালা করে কেননা বিচ্ছুর হুলে থাকে হিস্টামিন নামক ক্ষারক পদার্থ। তাই এসব ক্ষেত্রে জ্বালা নিবারণের জন্য যে মলম ব্যবহার করা হয়, তাতে থাকে ভিনেগার বা বেকিং সোডা, যেগুলো এসিড। এরা ঐ ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষারককে নিষ্ক্রিয় করে; ফলে আর জ্বালা থাকে না। কিন্তু টুথপেস্ট একটি ক্ষারীয় পদার্থ। যার pH, ৯-১১ এর মধ্যে হয়ে থাকে। তাই টুথপেস্ট ব্যবহারের ফলে দীপ্তির শরীরের ক্ষারীয় অবস্থা প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে ক্ষারের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। যা শরীরে আরও জ্বালার সৃষ্টি করবে।

সুতরাং টুথপেস্ট দেওয়ার পরে দীপ্তির শরীরের আরও অধিক যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে।

**প্রশ্ন ▶ ০৮**

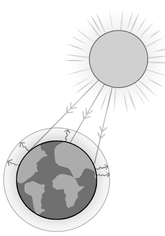

ক. কার্বন দূষণ কী? ১

খ. সুনামি হয় কেন? ২

গ. পরিবেশের উপর উদ্দীপকের চিত্রের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রভাব থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায় বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-৯ এর আলোকে]

**৮নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াই হলো কার্বন দূষণ।

**খ** সমুদ্রতলদেশে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস এবং নভোজাগতিক ঘটনা সুনামি সৃষ্টি করতে পারে। মহাসাগর ও সাগরের তলদেশের প্লেট যখন একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ হয়ে বিচ্যুত হয় তখন সেখানে প্রচণ্ড ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। আর এ ভূমিকম্পের কারণে সুনামি হয়।

**গ** উদ্দীপকের চিত্র দ্বারা গ্রিন হাউস ইফেক্ট তথা প্রভাব বুঝানো হয়েছে। কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ ওজোন, মিথেন, সিএফসি, নাইট্রাস অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প ইত্যাদি গ্রিন হাউস গ্যাস। পরিবেশের উপর এদের প্রভাব নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

বর্তমানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যানবাহন, শিল্পকারখানা এবং বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ বেড়ে যাওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে প্রাকৃতিক উপায়ে গাছপালার দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ কমে যাচ্ছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ বাড়ছে। একই সাথে জলবায়ুর পরিবর্তনে মানবজীবনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে । এছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে অসময়ে বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। ফসলের উৎপাদন কমে যাওয়া, জমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, বন্য পশুপাখির আবাসস্থল নষ্ট ইত্যাদি সমস্যাও দেখা দেয়।

**ঘ** উদ্দীপকের চিত্র দ্বারা গ্রিন হাউস ইফেক্ট বুঝানো হয়েছে যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এটি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নিচে বিশ্লেষণ করা হলো–

i. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
ii. জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার সীমিত করতে হবে।
iii. নগরায়ণ ও গৃহায়নের ক্ষেত্রে কাঠের পাশাপাশি বিকল্প সামগ্রীর ব্যবহার বাড়াতে হবে।
iv. জ্বালানি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
v. বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম জোরদার করতে জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।
vi. উন্নয়নশীল দেশগুলোকে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ সীমিত রেখে শিল্পোন্নতির জন্য প্রযুক্তি স্থানান্তর করতে হবে।
vii. জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে এ কাজে আর্থিক সহায়তা দানের জন্য উন্নত দেশগুলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
viii. জাতীয় শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচিতে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বিষয়ক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করে ভবিষ্যত প্রজন্মকে অবগত করতে হবে।
ix. রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে।
x. সিএফসি গ্যাসের বিকল্প উৎসের ব্যবহারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
xi. কম জ্বালানিতে চলে এমন যানবাহন আবিষ্কার করা ও উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ করা অতীব জরুরি।

অতএব বলা যায়, উপরিউক্ত উপায়ের মাধ্যমে গ্রিন হাউস গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

**প্রশ্ন ▶ ০৯** নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :

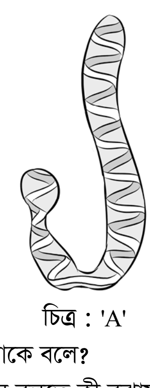

চিত্র : 'A'

ক. জিন ক্লোনিং কাকে বলে? ১

খ. নন-ডিসজাংশন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. 'A' চিত্রটির আকৃতি ও গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্রের কোন টেস্টের মাধ্যমে এবং কীভাবে প্রকৃত পিতামাতা চিহ্নিত করা হয়? মতামত দাও। ৪

[অধ্যায়-১১ এর আলোকে]

## ৯নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** একই জিনের অসংখ্য নকল তৈরি করাকে জিন ক্লোনিং বলে।

**খ** মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় অ্যানাফেজ ধাপে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলোর যে কোনো একটি জোড়ার ক্রোমোজোম দুটির একটি অপরটি থেকে পৃথক না হয়ে দুটিই যে কোনো মেরুতে চলে যায়। এ অবস্থাকে নন-ডিসজাংশন বলে।

**গ** উদ্দীপকে 'A' চিত্রটি ক্রোমোজোমের। নিচে এর আকৃতি ও গঠন ব্যাখ্যা করা হলো–

**আকৃতি :** ক্রোমোজোম সাধারণত লম্বাটে এবং সুতার ন্যায়।

**ভৌত গঠন :**

i. প্রতিটি ক্রোমোজোমের দেহ দুই গুচ্ছ সুতার মতো অংশ নিয়ে গঠিত। প্রতি গুচ্ছ সুতার মতো অংশ ক্রোমোনেমা নামে পরিচিত। এটি বহুবচনে ক্রোমোনেমাটা।

ii. কোষ বিভাজনের সময় প্রতিটি ক্রোমোজোমের সমান দুই ভাগে বিভক্ত অংশ হলো ক্রোমাটিড। প্রতিটি ক্রোমাটিড একটি ক্রোমোনেমা নিয়ে গঠিত।

iii. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমে দেখতে পাওয়া গোলাকৃতি ও সংকুচিত স্থান সেন্ট্রোমিয়ার বা কাইনেটোকোর নামে পরিচিত।

iv. ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের উভয় পার্শ্বের অংশ হলো বাহু।

v. ক্রোমোজোম একটি মাতৃকা বা ধাত্র দ্বারা আবৃত মনে করা হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে কিছু প্রোটিন ও অজৈব পদার্থের সমাবেশ মাত্র।

**রাসায়নিক গঠন :**

i. রাসায়নিকভাবে ক্রোমোজোম নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন, লিপিড, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম আয়ন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ অল্প পরিমাণে থাকে।

ii. ক্রোমোজোমে DNA ও RNA নামক দুই ধরনের নিউক্লিক এসিড বিদ্যমান।

**ঘ** উদ্দীপকের 'A' চিত্রটি হলো ক্রোমোজোমের। ক্রোমোজোমের মধ্যে ডিএনএ অবস্থিত। এ ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে প্রকৃত পিতামাতা চিহ্নিত করা যায়। নিচে প্রকৃত পিতামাতা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা হলো–

কোনো সন্তানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়া বা দাবি করা সন্তানের সত্যতা প্রমাণিত করতে DNA টেস্ট করা হয়। ডিএনএ টেস্ট করার সময় পিতা, মাতা ও সন্তানের মুখগহ্বর থেকে কটন 'বাড' এর মতো বিশেষ এক ধরনের ব্যবস্থার দ্বারা মুখের ঝিল্লির (মিউকাস) পর্দা নেওয়া হয়। গবেষণাগারে ঝিল্লির থেকে নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা পিতা, মাতা ও সন্তানের ডিএনএর একটি চিত্র (প্রোফাইল) প্রস্তুত করা হয়। এরপর সন্তানের ডিএনএ-এর চিত্রের সাথে পিতামাতার ডিএনএ চিত্রের সাথে মিলানো হয় এবং যদি প্রত্যেকের সাথে প্রায় ৫০% মিল পাওয়া যায়, তাহলে সেই সন্তানের জৈব পিতামাতা অর্থাৎ প্রকৃত পিতামাতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, DNA টেস্টের মাধ্যমে প্রকৃত পিতামাতা চিহ্নিত করা যায়।

**প্রশ্ন ▶ ১০** মিসেস মনসুরা খানম একজন সচেতন গৃহিণী। বাড়ির বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি হিসাব করে চলেন। প্রতিদিন গড়ে ৬ ঘণ্টা করে ১০০ ওয়াটের ৫টি বাল্ব জ্বালান। ইদানীং তিনি লক্ষ করেছেন বিদ্যুৎ বিল বেশি আসছে। এজন্য তিনি বাল্বগুলো পরিবর্তন করে ৫টি ২০ ওয়াটের এনার্জি সেভিং বাল্ব লাগান।

ক. তড়িৎ ক্ষমতা কী? ১

খ. একটি বাল্বের গায়ে ২২০ ভোল্ট–৬০ ওয়াট লেখা আছে, এর অর্থ কী? ২

গ. প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ৫ টাকা হলে পূর্বে মনসুরা খানমের কত বিল আসতো? ৩

ঘ. পরবর্তীতে বাল্বগুলোর পরিবর্তনে মনসুরা খানমের কী লাভ হলো? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

[অধ্যায়-১২ এর আলোকে]

## ১০নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কোনো তড়িৎযন্ত্র প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তড়িৎশক্তি ব্যয় করে বা অন্য শক্তিতে (তাপ, আলোক, যান্ত্রিক ইত্যাদি) রূপান্তরিত করে তাই তড়িৎ ক্ষমতা।

**খ** কোনো বাল্বের গায়ে ২২০ ভোল্ট – ৬০ ওয়াট লেখা থাকলে বোঝা যায় ২২০ ভোল্ট বিভব পার্থক্যে বাতিটিকে সংযুক্ত করলে বাতিটি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে এবং প্রতি সেকেন্ডে ৬০ জুল বৈদ্যুতিক শক্তি আলোক ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

**গ** এখানে, প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য = ৫ টাকা

মনসুরা খানমের বাল্ব সংখ্যা = ৫টি

প্রতিটি বাল্বের ক্ষমতা = ১০০ ওয়াট

∴ পাঁচটি বাল্বের মোট ক্ষমতা = (১০০ × ৫) ওয়াট = ৫০০ ওয়াট

বাল্বগুলো প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা করে জ্বলে,

সুতরাং মাসে ব্যয়িত বিদ্যুৎ শক্তি = ৫০০ ওয়াট × ৬ ঘণ্টা × ৩০ দিন

$$= \frac{৫০০ \times ৩০০}{১০০০} \times ৬ \text{ কিলোওয়াট-ঘণ্টা}$$

= ৯০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা

= ৯০ ইউনিট

মনসুরা খানমের মোট বিদ্যুৎ বিল = ৫ × ৯০ টাকা = ৪৫০ টাকা

∴ পূর্বে মনসুরা খানমের ৪৫০.০০ টাকা বিল আসতো।

**ঘ** উদ্দীপক থেকে পাই, মিসেস মনসুরা খানম একজন সচেতন গৃহিণী। তার বিদ্যুৎ বিল বেশি আসায় তিনি বাল্বগুলো পরিবর্তন করে এনার্জি সেভিং বাল্ব লাগান।

মনসুরা খানমের এনার্জি সেভিং বাল্বের সংখ্যা = ৫ টি

প্রতিটি বাল্বের ক্ষমতা = ২০ ওয়াট

∴ ৫টি এনার্জি সেভিং বাল্বের মোট ক্ষমতা = (২০ × ৫) ওয়াট

= ১০০ ওয়াট

সময়, t = (৬ × ৩০) ঘণ্টা = ১৮০ ঘণ্টা

আমরা জানি, ব্যয়িত শক্তি $= \frac{\text{ক্ষমতা} \times \text{সময়}}{১০০০}$ কিলোওয়াট-ঘণ্টা

মনসুরা খানমের মাসিক ব্যয়িত শক্তি $= \frac{১০০ \times ১৮০}{১০০০}$ কিলোওয়াট-ঘণ্টা

= ১৮ কিলোওয়াট-ঘণ্টা

= ১৮ ইউনিট

প্রতি ইউনিটের মূল্য = ৫ টাকা

∴ মনসুরা খানমের মাসিক মোট বিদ্যুৎ বিল = (১৮ × ৫) টাকা

= ৯০ টাকা

সুতরাং মনসুরা খানমের মাসিক বিদ্যুৎ বিল আসবে ৯০ টাকা

'গ' হতে পাই, মনসুরা খানমের পূর্বের বিদ্যুৎ বিল = ৪৫০ টাকা।

অর্থাৎ বাল্ব পরিবর্তনে মনসুরা খানমের মাসিক লাভ = (৪৫০ − ৯০) টাকা

= ৩৬০ টাকা

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বাল্ব পরিবর্তনে মনসুরা খানমের বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসছে এবং প্রতিমাসে তার ৩৬০ টাকা খরচ সাশ্রয় হচ্ছে।

**প্রশ্ন ▶ ১১**

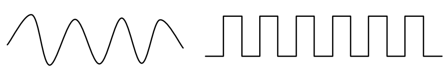

চিত্র 'ক' চিত্র 'খ'

ক. মাইক্রোফোন কী? ১

খ. যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট বেশি সুবিধাজনক কেন? ২

গ. 'খ' চিত্রের সংকেতটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্রের সংকেত দুটির মধ্যে কোনটির ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক, যুক্তিসহ তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

[অধ্যায়-১৩ এর আলোকে]

**১১নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মাইক্রোফোন হলো এমন একটি যন্ত্র যা শব্দ শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

**খ** ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে স্বল্প সময়ে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। ইন্টারনেটে নানা ধরনের ওয়েবসাইট, ই-মেইল, টেলিফোন ও ভিডিও যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান, সামাজিক নেটওয়ার্ক, বিনোদন, শিক্ষা ও গবেষণা টুল এবং বিভিন্ন ধরনের ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা রয়েছে। ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক যে কোনো কাজে এ ধরনের তথ্য ও সেবা যোগাযোগে সময় ও খরচ কম লাগে। তাই সহজ এবং সুলভ ব্যবহারের জন্যই যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট বেশি সুবিধাজনক।

**গ** 'খ' চিত্রের সংকেতটি হলো ডিজিটাল সংকেত।

নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকা তথ্য বা উপাত্তের অ্যানালগ সিগন্যালকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রক্রিয়া করা সম্ভব। সেটি করার জন্য একটু পরপর মানটি বের করে কোনো এক ধরনের সংখ্যায় প্রকাশ করে নিতে হয়। তারপর ধারাবাহিকভাবে এ সংখ্যাটির মানকে সংরক্ষণ করতে হয়। যখন সংকেতের মানকে সংখ্যায় বা ডিজিটে পরিবর্তন করে নেওয়া হয়, তখন তাকে ডিজিটাল সংকেত বা সিগন্যাল বলে। ডিজিটাল সংকেতের এ সংখ্যাগুলো প্রয়োজনমতো ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করে প্রক্রিয়া করতে হয়। এ সংকেত ব্যবস্থায় বাইনারি কোড অর্থাৎ ০ ও ১ ব্যবহার করে যে কোনো তথ্য, সংখ্যা, অক্ষর, বিশেষ সংকেত ইত্যাদি বুঝানো বা প্রেরিত হয়। যখন আবার সেটিকে তার মূল অ্যানালগ সিগন্যালে পরিবর্তন করতে হয়, তখন ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত মানের সমান বৈদ্যুতিক সিগন্যাল তৈরি করে নিতে হয়।

**ঘ** উদ্দীপকের 'ক' চিত্রে অ্যানালগ সংকেত এবং 'খ' চিত্রে ডিজিটাল সংকেত দেখানো হয়েছে। এ দুটি সংকেতের মধ্যে ডিজিটাল সংকেতের ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক। নিচে যুক্তিসহ আমার মতামত বিশ্লেষণ করা হলো–

দূরত্ব বেশি হলে অ্যানালগ সংকেতের ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে কমতে এক সময় হারিয়েও যেতে পারে। একে বাঁচিয়ে রাখতে পুনঃবিবর্ধন করতে হয়, কিন্তু এতে নয়েজ বেড়ে যায়। ফলে সংকেতের মান হ্রাস পায় বা সংকেত বিকৃত হয়। কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যাল যেতে যেতে বিবর্ধিত হয়। ফলে সংকেত একই রকম থাকে। স্বল্পসংখ্যক কম্পিউটার নেটওয়ার্কের জন্য অ্যানালগ সংকেতে ব্যয় অনুযায়ী প্রাপ্তি বেশি, কিন্তু বেশি সংখ্যক কম্পিউটার নেটওয়ার্কের বেলায় ডিজিটাল সংকেতের ব্যয় অনুযায়ী প্রাপ্তি বেশি। বর্তমান যুগ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের যুগ বা ইন্টারনেট প্রযুক্তি নামে পরিচিত। এ ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক, যেখানে প্রাইভেট, পাবলিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি স্থানীয় বা বৈশ্বিক সব ধরনের নেটওয়ার্কগুলো জড়িত হয়েছে। তাই অ্যানালগ ডিভাইসের চেয়ে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যয়বহুল হলেও ডিজিটাল সার্ভিসের বেলায় সর্বসমেত ব্যয় কম। অ্যানালগ ডিভাইসে ক্রস কানেকশন হতে পারে ডিজিটালে তা হয় না।

অতএব উপরের আলোচনা হতে বলা যায়, অ্যানালগ সংকেত বা অ্যানালগ প্রযুক্তি ব্যবহারের চেয়ে ডিজিটাল সংকেত বা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার সুবিধাজনক।